বেদনার অশ্রু

আবুল হোসেন

বেদনার অশ্রু

আবুল হোসেন

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

বেদনার অশ্রু

আবুল হোসেন

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

মতিঝিল অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল
জানুয়ারি/২০১৩

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ডিজাইন
এস এম শামছুদ্দিন
নকসা কেন্দ্র বিসিক
১৩৭-১৩৮ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ১৫০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

Bedonar Osrow: Written by **Abul Hossain**, Published by: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk. 150/- U$: 5 ISBN - 984-70241-0058-0

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার প্রিয় চির সঙ্গীনী স্ত্রী
নূরজাহান এর মঙ্গল কামনার
উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি উৎসর্গ করছি।

www.pathagar.com

ভূমিকা

কয়েকটা ছোট ছোট গল্প নিয়ে লেখা আমার এই বইটা। লেখার কাহিনীগুলো ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রত্যেকটি লেখায় জীবন বেদনার সুর মিশে আছে এরই মাঝে। দুঃখকষ্ট, শোকতাপ, হাহাকার নিয়ে মানবজীবন। জীবনকে গ্লানীমুক্ত করা সম্ভব হলেও ভাগ্য পরিবর্তন তার চেয়ে অনেক কঠিন। স্বর্গীয়ভাগ্য, ভূভাগ্য তো নয়ই তবে মনুষ্যভাগ্যের পরিবর্তন আনতে প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম। আমার লেখার প্রত্যেকটি গল্পে ব্যর্থতার রেশ টেনেছি। লেখার ভিতরে আমার মনের আবেগের প্রকাশ ঘটেছে। আমি তেমন কোন ভাষা সাহিত্যিক নই। বড় কিছু সাহিত্য চর্চাও আমার ছিল না। আমি ছিলাম একজন সাধারণ চাকুরে মানুষ। এ কারণে আমার লেখায় কোথাও দুর্বলতা, ভুলভ্রান্তি কিংবা কোথাও ভাষার মৌলিক পার্থক্য পাঠকের কাছে ধরা পড়তে পারে। ভুলভ্রান্তিগুলো পাঠক ক্ষমা করে দেবেন এ আমার একান্ত প্রত্যাশা। তাহলেই আমি ধন্য হবো।

আমার শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও যতটুকু পেরেছি লিখে গেছি। পিছ পা হইনি। সরেও দাঁড়াইনি। লিখতে যেয়ে আনন্দ এবং পরিতৃপ্তি দু'টোই পেয়েছি বলে যৎসামান্য লিখতে পেরেছি। পাঠকবর্গ যদি বইটা পড়ে সামান্যও আনন্দ আহরণ করতে পারেন তা হলে আমার লেখার আনন্দ যথাযথ কাজে লাগবে। মানুষ এবং জীবন এই দুয়ের দৃষ্টি ভঙ্গির একটা মূল্যায়ন তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। আমার হারিয়ে যাওয়া অতীতকেও এখানে টেনে এনেছি। জীবনের শূন্যতাকে পূর্ণ করার জন্যে।

পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে কয়েকটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হয়। যেমন জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, কাজ করার জন্য পরিশ্রম, বিভিন্ন সমস্যা বিপত্তি অতিক্রম করার জন্য ব্যক্তিত্ব প্রকাশে কৌশলগত জ্ঞান। আমি এসব বিষয়ে তেমন প্রতিষ্ঠিত হতে পারিনি বলে চলার পথে নানান অসুবিধা আমাকে ঘিরে রেখেছে।

www.pathagar.com

লেখার জন্য ভিতরে ভিতরে যে আকাঙ্ক্ষাটুকু লুকিয়ে রেখেছিলাম একদিন তা ফুটে উঠলো। লেখার প্রচেষ্টা আমাকে শক্তি যোগালো। মনোযোগ দিলাম লিখব বলে। পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় মানসিক ঝুঁকিতে থেকেছি। লেখক হিসেবে আমার অনাদরটা হয় তো অস্বীকৃত পুরস্কার হিসেবেই থাকলো।

পরিশেষে বলতে চাই বইটি প্রকাশনার জন্য জনাব শহীদুল্লাহ, প্রডাকশন এন্ড মার্কেটিং ম্যানেজার, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড এর আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আমার হাতেখড়ি অভ্যাসটা বয়সের ভাড়ে থেমে থাকলো। প্রত্যেক লেখকের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে লেখার প্রেরণা এবং সাধনা। এটা যার যত বেশী সে তত উপরে উঠেছে। আমার লেখার অভ্যাসটাকে তেমন করে তৈরী করতে পারিনি বলে নীচে পড়ে থাকলাম।

গ্রন্থকার

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

লেখক আবুল হোসেন এর লেখা 'বেদনার অশ্রু' বইটার গল্পগুলো ভাষা সাহিত্য রসে প্রাণবন্ত এবং শ্রুতিমধুর। ভাষার গতিধারা আধুনিক, সহজ ও সরল। সমগ্র গল্পের কাহিনীগুলো নিঃসন্দেহে বাস্তবধর্মী।

পুস্তকটি সম্পাদনা প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয় লেখক তাঁর প্রতিটি গল্পে দুঃখের উপাদান দিয়ে গল্পগুলো সাজিয়ে নিয়েছেন। বলা বাহুল্য বইটিতে সুখের অলংকার খুব বেশী অলংকৃত হয়নি। গল্পের স্রোতধারায় আছে বেদনার তরঙ্গ। তবুও গল্পগুলো পড়তে অনেক ভাল লাগবে। তিনি তাঁর লেখার কাহিনীগুলোর ভিতরে নিজেকেও সম্পৃক্ত করেছেন। এটা তাঁর লেখার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। লেখক সত্যের উপলব্ধি নিয়ে সমাজের নিষ্ঠুরতাকে গল্পের ভেতর তুলে ধরেছে যা আমার কাছে লক্ষণীয় বিষয় বলে মনে হয়েছে। অনেক সময় গল্প কেবলমাত্র গল্প নয়। গল্পের মাধ্যমে লেখক সত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেন। লেখক এখানে সেই বিষয়টার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আমি মনে করি বইটার প্রতিটি গল্পে আছে সাহিত্য রুচির উপাদেয় এবং রসতৃপ্তির স্বাদ। 'অপরাধী প্রেম এবং নিরুপমা' এই গল্প দুটোর প্রথম অংশে আনন্দ প্রেম ভালবাসা দিয়ে গল্পের কাহিনীকে উপজীব্য করা হয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা আবুল হোসেন তাঁর প্রতিটি গল্পে বেদনার সংস্কৃতিকে লালন করেছেন যার ফলে সাহিত্যের ভাব দর্শন পাঠকের কোমল হৃদয়কে আন্দোলিত করবে। আমি মনে করি প্রতিটি পাঠক বেদনার অশ্রু বইটি পড়লে কাঁচামিঠা স্বাদের মতো আনন্দ বেদনার রস উপভোগে পরিতৃপ্তি পাবে। পরিশেষে একটা কথা, তা হচ্ছে- বইয়ের গল্পগুলো যারা পড়বেন তখন তাদের সময়টুকু বৃথা যাবে না। পাঠকের চাওয়া পাওয়ার পরিতৃপ্তি হবে সোসাইটির স্বার্থকতা।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

নিরুপমা	০৯
অপরাধীর প্রেম	২৭
শেষ বদলি	৫৪
শৈশব স্মৃতিকথা	৬৬
বিত্তনেশায় সোনার হরিণ	৯২

www.pathagar.com

নিরুপমা

বেশ কিছু দিন হলো সিনেমা দেখা হয়নি, নানা কারণে। আজ রোববার ছুটির দিন। মনের অবস্থাটা ভাল লাগছে না। সময় কাটাবার মত তেমন কিছু দেখি না। তাই ইচ্ছে হলো একটা সিনেমা দেখার। চিন্তা করে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। শহরে এখনও কারো সাথে তেমন পরিচয় হয়ে ওঠেনি। আমি তেমন মিশুক মানুষ ছিলাম না বলে ভালবাসার বন্ধু-বান্ধবও জোটাতে পারিনি। অবশেষে সিনেমা দেখার আগ্রহটা আমার ইচ্ছাকে বাড়িয়ে দিলো। সময় নষ্ট না করে তৈরী হলাম ভাবনীপুরে সিনেমা হলে আসার।

ঘড়িতে দুপুর দুটো বেজে গেছে। ম্যাটিনী শো দেখব। হাতে সময় কম। এক্ষুণি বেরুতে হবে নতুবা টিকিট পাবোনা। কোন সাজগোজ নয়। পোশাকে মনোযোগ না দিয়ে চটপট ভাঁজ ভাঙ্গা জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পরলাম। ফুটপাট ধরে হেঁটে যাচ্ছি। যাচ্ছি বিজলী সিনেমা হলে বই দেখতে। সেকেন্ড ক্লাশের টিকিট কিনে হলে ঢুকলাম। প্রায় তিন ঘন্টা সিনেমা দেখে আলাদা মন নিয়ে ফিরছি। ফিরছি পায়ে হেঁটে ফুটপাত ধরে। সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে আসছে। সবাই রাস্তার পাশ দিয়ে এদিক ওদিক হেঁটে যাচ্ছে, আর আসছে। কে কোথায় যাবে কে জানে? রাস্তায় সিনেমার শো ভাঙ্গা মানুষের ভীড়। সিনেমা দেখে স্বামী স্ত্রী ফিরছে বাসায়। চলতে চলতে বৌয়ের মুখে মশকরা শুনতে শুনতে পথ চলে দুজনে। অফিস ছুটির কর্মক্লান্ত ঘরমুখো মানুষের ভীড়। খবরের কাগজ হাতে কেউ কেউ হনহনিয়ে বাড়ী ফিরছে। অনেকে ভীড় ঠেলে আগেভাগে যেতে চায়। মেয়েরা ভীড়ে ধাক্কা খাওয়ার ভয়ে নিজের গা বাঁচিয়ে সাবধানে হাঁটছে। কেউ কেউ মৌজ করে কলকাতা শহর দেখে ফিরছে বাসায়। কেউ ট্রামে, কেউ বাসে অনেকে আবার ফুটপাথ ধরে পায়ে হেঁটে। ভাগ্যবানেরা প্রাইভেট কার নয়তো মটর সাইকেল হাঁকিয়ে চলছে। সবার লক্ষ্য এখন বাড়ী ফেরা।

সূর্য ডুবুডুবু। নগরীর বুকে সন্ধ্যের আমেজ ছড়িয়ে পড়তে শুরু হয়েছে। আকাশটাও আজ কেমন যেন থমথমে হয়ে ঘুলিয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে কাকগুলো কা কা করতে করতে কালীঘাটে কালীগঙ্গা নদীর ধারে সারিসারি গাছের ডালে ডালে বাসায় ফিরছে। ওদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে চিল উড়ছে কালীঘাট মন্দিরের মাথার ওপর। দেখতে দেখতে অন্ধকার প্রায় নেমে এলো নগরীর বুকে।

কালীঘাট ব্রীজের পাশে আলীপুর সেন্ট্রাল জেল। বিরাট এলাকা জুড়ে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই জেলখানা। জেলখানার উপর তলার এক দিকে একটা অন্ধকার সেল। বাইরের আলো বাতাস এর ছোট জানালা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেনা। সামান্য একটু করলেও প্রায় অন্ধকার থেকে যায় সেলের ভেতরটা। সমির মিয়া রোজ এই ছোট জানালার রডটা ধরে বাইরের দিকে উদাস চোখে চেয়ে থাকে। বাইরের জগৎটা তার কাছে সম্পূর্ণ অজানা। অনেক দিন থেকে সে এই জানালা পথে একভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে কি সব দেখে। কি দেখে তা সেই জানে। তার চোখ দুটো কী যেন খুঁজে বেড়ায় বাইরের মুক্ত পৃথিবীর রাস্তায়। প্রতিদিনের মত সেদিনও সে দেখতে পায় রাজপথ লোকে লোকারণ্য। সে ওপারের দৃশ্য দেখতে পায়। দেখতে পায় কত লোক যাতায়াত করছে ফুটপাথ ধরে। সবই তার অচেনা মুখ। যেটুকু দেখে তার চোখে চেনাজানা মুখ একটাও আসে না। সমির রাজপথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মানুষের ভীড়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোক আর লোক।

সন্ধ্যা নামার সাথে চারপাশে শাঁখ বেজে উঠলো। সমির সেলের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মাগরিবের আজান শুনতে চায়। আজানের ধ্বনি কোনদিন তার কানে আসে না। রাতে চাঁদ দিনে সূয্যী ওঠে, ঠিক সময়ে অস্ত যায়। সবই হয়। হয়না কেবল মসজিদের আজান। অসহ্য লাগে তার।

সমির তার সেল থেকে কোন মসজিদ দেখতে পায় না। সে বড় বড় চোখ নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে। কান পেতে থাকে আজান শোনার জন্যে। জেলের ক্ষুদ্র কক্ষের জানালা পথে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দূরে, অনেক দূরে। মাঝে মাঝে ভাবতে থাকে তার অতীতের কথা, তার সর্বনাশের কথা, তার সুখের সংসারের কথা। কিছুই সে ভুলতে পারেনি। এসব কথা মনে হলে ভাবে এটা ছিল তার

www.pathagar.com

স্বপ্নজীবন। কালের অমোঘ নিয়মে তার সুখের নীড় ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে গেল। এসব কথা ভাবতে ভাবতে তার অতীত জীবনের সবকিছু ছায়াছবির মত স্মৃতি পটে স্পষ্ট ভেঁসে ওঠে। মেয়ের আদুরে আদুরে মুখ, নেচে নেচে খেলার দৃশ্য মনে হলে ভেতরের অসহ্য জ্বালায় সমির ছটফট করতে থাকে। মাঝে মাঝে কষ্টের আকুলতায় তার ভেতরটা কেঁপে ওঠে। স্ত্রীকন্যাদের হারিয়ে তার সারাজীবন বড়ই দুর্বিসহ। তাদের কথা মনে হলে সে অবুঝ শিশুর মত হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। কষ্টের খোঁচায় খোঁচায় সমিরের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে রেখেছে দীর্ঘদিন ধরে। জেলখানা এমনি এক জায়গা যেখানে মানুষ বেশী দিন থাকলে এমনিতেই পাগল হয়ে যায়। এখন সমিরের কারা জীবন ফাটছে পাগল জীবনের মতো।

গ্রাম বাংলায় সমিরের দুঃখকষ্টের জীবন প্রবাহ দিনকাল নিয়ে ধীরে ধীরে এগুতে থাকে আলো-আঁধার ভবিষ্যতের দিকে। শুরু হলো তার নিষ্ঠুর জীবন নাট্য।

উকোশপুর গ্রাম। কয়েক ঘর চাষাভূষা লোকের বাস। গ্রামের নিত্যদিনের জীবনে আছে ছন্দময় প্রাণ চঞ্চল। চাষীরা সকালে পান্তাভাত খেয়ে মাঠের কাজে যায়। মেয়েরা ঢেঁকিতে ধান ভানে। সন্ধ্যে হলে ঘরে ঘরে মিটমিট করে জ্বলে কেরোসিনের কুপি বাতি। গ্রামের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা নগ্ন দেহে পাড়ায় ছুটাছুটি করে। ধূলোকাদায় গড়াগড়ি যায়। বোশেখ জ্যোষ্ঠির ভরা দুপুরে ঝিঁঝিঁ ডাকা গাছের ছায়ায় ক্লান্ত চাষীরা গামছা পেতে ঘুমায়। ঝিলমিল দুপুরে গাছের ছায়ায় বসে থাকতে থাকতে চোখে আসে ঘুম ঘুম ঝিমুনি। পাড়ার বৌয়েরা ভর দুপুরে আমতলার ছায়ায় বসে বসে একে অন্যের মাথার চুলে বেনি কেটেকেটে উকুন বেছে দেয়। আর ঘন্টার পর ঘন্টা চলে ইয়ার্কি ফোস্টামী গল্প। হিলহিলে বাতাসে ওদের সারা শরীরটা আমেজে ভরে ওঠে। এমনি এক গ্রামে সমিরের জন্ম। তার বাপদাদা সাত পুরুষের জন্ম।

সমির এখন তাগড়া জোয়ান। বিয়ের বয়স হয়েছে। ভরা যৌবন। বিয়ের হিলহিলে বাতাস তার যৌবনে সুরসুরি দেয়। তার দেহমনে যৌবনের তুফান। খোঁজাখোঁজি করে পাত্রি খুঁজতে হয়নি। কিছু টাকা

www.pathagar.com

পয়সা খরচ করে উৎসব ছাড়াই পাশের গ্রামে দেনুবাড়িতে ২০ বছর বয়সী কুলসুম নামে এক তরুণীর সাথে সমিরের একদিন বিয়ে হয়ে গেল। গ্রাম দেশে গরীবের ঘরে এরকম বিয়েই মানায়। বিয়ে করে সমির ঘরে টুকটুকে আনকোরা বউ তুললো। উজ্জ্বল কৃষ্ণ বর্ণ গায়ের রং। ভরা যৌবন যেন আনন্দের ছাঁচে গড়া। কুলসুমও সরল মনের দিলখোলা স্বামী পেল। বউয়ের মিষ্টি মিষ্টি কথায় সমির সব সময় উৎফুল্লে ভরে থাকে। ঘোমটা পরা নতুন বউ লজ্জায় স্বামীর সাথে বেশী কথা বলতে পারে না। বেশীক্ষণ চুপ থাকে। মন চায় কিন্তু লজ্জায় ইতস্ততঃ করে কুলসুম। সমির বউকে কাছে ডাকলে কুলসুম হাসি মুখে স্বামীর কাছে আসে। একটু আদর করে বউকে। আস্তে আস্তে তার লজ্জা মুছে যায়। ঐকান্তিক ভালাবাসায় ওরা দুজনে অত্যন্ত প্রিয় সামগ্রী হয়ে পড়ে। সমির তার আদরের নতুন বউ নিয়ে নতুন সংসার পেতে জীবনকে সাজিয়ে নিল। স্বামীস্ত্রীর সংসার। দুজনের ছোট সংসারে হাসি আনন্দে ভালই চলে ওদের দিনকাল। কুলসুম তার বুকের ভেতরের সবটুকু উজার করে স্বামীকে ভাল বাসে। ওদের সংসারটা শান্তিতে ভরে ওঠে।

সমিরের নিজস্ব বিষয় সম্পত্তি বলতে বাসের জন্যে একটুকরো পৈত্রিক ভিটে। সামান্য কিছু কৃষি জমি। আর এক জোড়া হালের বলদ। চাষ আবাদে তাদের সুখে শান্তিতে দিন চলে। সমির ছিল খেটে খাওয়া ঘর্মাক্ত হালকর্ষণ চাষী জীবন। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির জীবন।

সমিরের পাশের বাড়িতে থাকে মরিয়াম বেওয়া। স্বামী মরে গেছে অনেক আগে। তখনো তার যৌবন শেষ হয়নি। সে আর বিয়েও করেনি। সাথে থাকে ষোল সতের বছরের আধজোয়ন ছেলে। তার একটাই ছেলে। গরীবের ছেলে। লোকের বাড়ি কামলাগীরি করে যা আয়রোজগার করে এদিয়ে মাবেটা দুবেলা দুমুটো খেয়ে না খেয়ে দিন চলে। মরিয়াম বেওয়া সমিরকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসে। মন থেকে স্নেহও করে। বিপদে আপদে পাশে এসে দাঁড়ায়।

কুলসুম গভর্বতী। সন্তান প্রসব করবে। সমির ব্যস্ত হয়ে ছুটলো তার মরিয়াম চাচিকে ডেকে আনতে। মরিয়াম বিবি দ্রুত এসে কুলসুমের প্রসাব করায়। সমির আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে। গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

www.pathagar.com

ঘরের কাছে এগিয়ে এসে বলতে থাকে চাচি চেলে না মেয়ে? আঁতুর ঘর থেকে মরিয়াম বেওয়া বলতে থাকে, ছেয়ে, মেয়ে হয়েছে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে। সোনার পুতুলের মত তোর মেয়ে হয়েছে। চাচি সব ঠিকঠাক তো? তুই কোন চিন্তা করিসনে। হাততুলে সমির বললো আলহামদুলিল্লা।

দেখতে দেখতে দিনাতি সপ্তা মাস কেটে গেল। একদিন তারা ঘরে বসে ঠিক করলো। মেয়ের নাম রাখবে। এখন তারা মেয়ের নাম রাখা নিয়ে ব্যস্ত। রীতিমতো নামের হাট বসে গেল ওদের বাড়ীটাতে। এনিয়ে একটা উৎসবে পরিণত হলো তাদের মাঝে। তারা বারবার মেয়ের জন্য নাম খোঁজে, নাম বাছাই করে কিন্তু পছন্দ হয় না কোনটাই। একজনের পচ্ছন্দ হলে আর একজন না করে। এমনি করে চলে তাদের নাম বাছাই আয়োজন।

আজকাল সেই পুরানো জামানার নাম কারো কি আর ভালো লাগে? কিনাম রাখলে সবাই পচ্ছন্দ করবে, পাড়ার লোকেরা মেয়েকে ঐ নামে ডাকবে, আদর করবে। শেষে অনেক যাচাই বাছাই করে কুলসুম খুঁজে বার করলো একটা সুন্দর নাম। কুলসুম মনের মতো মেয়ের নাম দিল নিরুপমা। সুন্দর মেয়ের সুন্দর নাম। তারা মেয়েকে আদর করে নিরু বলে ডাকবে। নামটা ঠিকই হয়েছে। তারা খুশিতে আটখানা। কুলসুম স্বামীকে বলল, আজ পর্যন্ত এমন নাম শুনেছ? সমির বলে, না শুনিনি। কুলসুম বলে, সত্যি তো? হ্যাঁ সত্যি। দুজনে একটু হেসে হেসে বলে, চমৎকার! সুন্দর নাম হয়েছে। নিরূপমা হবে আমাদের একমাত্র আদরের মেয়ে।

স্নেহের কন্যা নিরূপমাকে পেয়ে তাদের সংসার জীবন মধুর হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে নিরু বড় হতে থাকে। হাঁটি হাঁটি পা ফেলে হাঁটতে শিখেছে, মিষ্টিমিষ্ট কথা বলতে শিখেছে।

মেয়েকে নিয়ে তাদের আনন্দ আহলাদে দিন কাটে। নিরূপমা তাদের ঘর আলো করা একমাত্র আদরের ধন। সে সমিরের চোখের মনি। নিরুর বাবা ডাকে সমিরের প্রাণ জুড়ায়। সমির মেয়েকে কোলে নিয়ে স্নেহের চুমু দিয়ে বলতো, "তুই ঠিক আমার মায়ের মতো। তোর

www.pathagar.com

মুখের সাথে আমার মায়ের মুখ।" নিরুর ছুটাছুটি, সারাদিন বাবা ডাকাডাকি শব্দে সমিরের ঘর আনন্দে ভরে থাকে। নিরু খেলতে খেলতে ছুটে এসে সমিরকে জড়িয়ে ধরে বাবা ডাকলে সমিরও মেয়েকে বুকে তুলে আদর করে বলতো আমার কোলে চাঁদ হাসছে। নিরুকে কোলে নিয়ে স্নেহচুম্বন করলে সমির যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। সমির নিরুকে আন্তরিক ভালবাসে। তাকে অনেক ভালবাসে। প্রাণের ধারায় সমিরের মন নিরুর জন্যে উথলে উঠে। নিরু বড় হাসতে ভালবাসে। মেয়ের মুক্তাঝড়া হাসিমুখ দেখলে সমির মেয়েকে কোলে নিয়ে বলে, তুই কত ভাল, কত সুন্দর।

সমির একদিন লক্ষ্য করে নিরু ঘরের মেঝেতে বসে বসে কেমন যেন করছে। কম্পিত অস্বাভাবিক ভাব। মুখের চেহারা একেবারে নীল হয়ে গেছে। মেয়ের শরীরে হাত দিয়ে সমির বুঝলো জ্বরে নিরুর দেহ পুড়ে যাচ্ছে। মেয়েকে কোলে তুলে ঘরে পেতে রাখা বিছানায় শুইয়ে দিল। সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মস্তিস্ক প্রদাহ জ্বরে শয্যাশায়ী হলো। অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলে গেল। জ্বরে নিরু বিছানায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে। সমির ডাকে "মা নিরু" নিরু উত্তর দেয়না। মেয়ের অবস্থা দেখে তারা আতংকে কাঁপতে থাকে। নিরুর পুরো দুটো দিন যন্ত্রণা ভোগে কাটলো। তার সমস্ত শরীরে তীব্র ব্যথা। এদিকে ওদিকে নড়াচড়া করতে গেলে ব্যাথায় ককিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে চৈতন্য হারিয়ে ফেলে। চৈতন্য লাভ করলে জ্বরের ঘোরে বিকার বকতে থাকে। সে বারবার কি যেন বলতে চেষ্টা করে কিন্তু কিছুই ঝুঝা যায় না। তার মায়া ভরা ডাগর ডাগর চোখ দুটো লাল টকটকে হয়ে ঠেলে উঠে এসেছে কপালের ওপর। চোখের মনি দুটো যেন ফেটে বেড়িয়ে আসছে।

নিরুর অবস্থা দেখে সমির অস্থির হয়ে পড়ে। তার হাতে যে কটা টাকা পয়সা ছিল মেয়ের অসুখের জন্য সবই খরচ করতে হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সংসারে টাকা পয়সার টানাটানি পরে গেল। শেষ পর্যন্ত ঘরের কাঁসাপিতল যা কিছু ছিল সবই বিক্রি করতে হলো মেয়ের চিকিৎসার জন্য। ডাক্তার, কবিরাজ এবং পীর ফকিরের ঝারফুঁক

www.pathagar.com

করে সমির শূন্য হস্ত হয়ে পড়ে। সংসার চালিয়ে নেবার মতো তাদের ঘরে এখন আর কিছুই থাকলোনা। তারা চিন্তায় নিরন্তর। এতো কিছুর পরেও নিরাময়ের কোন লক্ষণ বুঝা যাচ্ছে না। আরোগ্যের জন্য সমির বড় ব্যস্ত হয়ে আবারও ছুটলো পাশের গাঁয়ে ডাক্তার আনতে। ডাক্তার এসে নিরুর জ্বর মাপলো। রুগী দেখে ডাক্তার বুঝালো মৃত্যু নিশ্চিত, বুঝালো ও বাঁচবে না। তবুও এক শিশি ওষুধ দিয়ে গেল। যাবার সময় সমিরকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গম্ভির মুখে বলে গেল বড় কঠিন রোগ। একথা শুনে সমিরের মাথায় বাজ পড়ার মতো অবস্থা হলো। সে নির্বাক, দিশাহারা হয়ে পড়ে। তাদের চিন্তা আরও বেড়ে গেল। মুহূর্তে মেয়ের জন্য ওদের ভেতরটা কষ্টে ছারখার হতে থাকে। সমির ভারী গলায় "এই নিন" বলে ডাক্তারের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে তাঁকে বিদায় দিল।

ওষুধু খাওয়ানোর সময় হলে ডাক্তারের নির্দেশে সমির মেয়েকে দাগ মেপে মেপে ওষুধ খাওয়ায়। অর্ধেক গলায় অর্ধেক চোয়ালের পাশ দিয়ে বাইরে চলে আসে। পেটে কিছু যায় না। ডাবের পানিটুকুও গিলতে পারে না। অনেক সময় অনেক চেষ্টা করেও না ওষুধ না ডাবের পানি কিছুই খাওয়াতে পারে না। এভাবে একদিন দু'দিন করতে করতে কটাদিন কেটে গেল। ওরা স্বামী স্ত্রী দুজনে নিরুর অন্তিম শয্যাপাশে পাশাপাশি বসে রাত কাটায়। সমির ও কুলসুম লক্ষ্য করে নিরুর পদ্মের মত সুন্দর মুখখানি শুকিয়ে কালিমায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। মেয়ের অবস্থা দেখে ওরা ঘাবড়ে যায়। কারো মুখে কথা নেই।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। কুলসুম কুপিটা জ্বেলে নিরুর শিয়রে বসে মনে মনে এক ধ্যানে আল্লাহকে ডাকে। ঘরের ভেতরটা নীরব নির্জন, সাড়া নেই, শব্দ নেই। নিরুর দুদিকে দুটি প্রাণী। সন্ধ্যায় মসজিদ থেকে মাগরিবের আজান ভেসে এলো। তারা মোয়াজ্জিনের আজান শোনে আর চোখের জলে ফ্যালফ্যাল করে মেয়ের মুখের দিকে নিমিষ হারা চোখে তাকিয়ে থাকে। আজান শেষে সমির এবং কুলসুম দুজনে চমকিয়ে উঠে। আস্তে আস্তে নিরুর হৃৎপিন্ডের গতি বন্ধ হয়ে গেল। তারা প্রত্যক্ষ করলো

www.pathagar.com

নিরুর আত্মার প্রস্থান ঘটলো অর্থাৎ নিরু আর নেই। তার মৃত্যু হলো। সন্ধ্যার পুণ্য তিথিতে মৃত্যুর শান্ত শীতল কোলে নিরু মুক্তি লাভ করলো। মেয়েকে বাঁচানোর জন্য ওদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। ঘরের আলোটা ক্ষীণ হয়ে জ্বলছে। সমির মেয়ের মাথাটা বালিশ থেকে নীচে নামিয়ে রাখলো। মৃত মেয়ের মুখখানা দেখে সমির উম্মাদের মত মর্মভেদী চীৎকারে কেঁদে উঠে। তখন কুলসুমের কণ্ঠে করুণ সুরে ক্রন্দন ধ্বনিত হতে থাকে। সমির তার মেয়ের মৃত দেহটা কোলে তুলে বারংবার বলতে থাকে, মা মা নিরু কথা বল, একবার বাবা বলে ডাক। বলতে বলতে সে হাউমাউ করে আকাশ ফাটানো কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কুলসুমও মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে ঢলে পড়ে। মেয়ের দিকে ফিরে তাকানোর আঘাতে মূর্ছা যায়।

রাত এলো। রাতে সমিরের বাড়ীর আঙ্গিনাটা চাঁদের আলোয় ভরে গেছে। পূর্নিমার চাঁদ তার সবটুকু আলো ঢেলে দিয়েছে সমিরের বাড়িটাতে। শান্ত নীরব। ধপধপে জ্যোছনা, গোটা বাড়ীটা ঝকঝকে পরিষ্কার। তখন রাতের পরিবেশটা এতোই সুন্দর দেখাচ্ছিল যেন আসমান থেকে ফেরশেতারা নিরুর প্রাণহীন দেহটাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। রাত দুপুরে চাঁদের আলোয় দোয়েল পাপিয়া কলতান সুরে নিরুর বিদেহী আত্মার স্তুতি গাইছে। দেখতে দেখতে রাত শেষে আকাশের চাঁদ ডুবলো, অন্ধকার কেটে ভোর হলো। আস্তে আস্তে পূর্ব গগন ফর্সা হলো। নিরুর লাশের পাশে দু'জন মানুষ পাথর হয়ে রজনীর শেষ প্রহর পর্যন্ত বসে কাটালো। সমির বুঝলো এতো রাতে কাঁদতে নাই। কিন্তু তার পোড়া চোখ দুটো বুঝলো না। কান্নায় সমিরের চোখ মুখ ফুলে উঠেছে। কুলসুমও সারারাত কেঁদে কাটালো। এক রাতেই তাদের শরীরটা কেঁদে কেঁদে আধখানা হয়ে গেছে।

সকালে প্রতিবেশীদের সাথে সমির নিরুর সুন্দর দেহটা ধুয়ে মুছে কাফন পড়িয়ে মসজিদ প্রাঙ্গনে খাটিয়ায় রাখা হলে সমির এক দৃষ্টিতে মেয়ের খাটিয়ার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সমির কচিখোকার মত ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে আর টস্‌টস্ করে দু'চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। জানাজা শেষে কয়েকজন মিলে নিরুর খাটিয়া কাঁধে তুলে

www.pathagar.com

নিলো। সমির কাঁন্নার গলায় বলতে থাকে চল নিরু চল কবর খানায় চল। নিঃশব্দে সকলে মিলে কবরের দিকে চলে। কাঁন্নার গলায় সমির কালেমা পড়তে পড়তে নিরুর খাটিয়া বহন করে নিয়ে চলে। তখন সমিরের ভেতরটা কষ্টে ধরফর করে ছিঁড়ে পড়ে। মেয়েকে কবর দিয়ে সমির বাড়ী ফিরলো। স্বামীকে দেখে কুলসুম চীৎকার করে কেঁদে উঠে। কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। পাড়ার দু চারজনেও তাকে ধরে রাখতে পারে না। সমিরের মুখে শব্দ নেই, আছে শুধু দুচোখ ভরা অশ্রু।

মেয়ের শোকে ওরা দু'জনেই ভেঙ্গে পড়লো। বাড়ীঘর খাঁ খাঁ করছে। কারো মুখে কথা নেই। তারা আহার নিদ্রা ছেড়ে দিল। সমির কখন কখনো নিরুর পরনের জামা কাপড়গুলো দুহাতে বুকে চেপে ধরে ঘরের দেওয়ালে পিঠ রেখে পাগলের মত মনমরা হয়ে বসে থাকে। নিরুর মায়ের মুখে কথা নেই। পেটে দানাপানি নেই। মেয়ে হারা অসহ্য যন্ত্রণায় কুলসুম শাড়ীর আঁচলটা মুখে গুঁজে মাঝে মাঝে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে। কখনো কখনো তার স্তূপীকৃত কান্নায় নেমে আসে অঝোর বর্ষণ। সমির স্ত্রীর জলভরা চোখ দুটো তার কাঁধের গামছাটা দিয়ে মুছে দিয়ে বলতো "কেঁদোনা কুলসুম কেঁদো না। তুমিও তো অন্তর্দ্দহে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছ। তুমিও যদি না বাঁচ আমি কাকে নিয়ে বাঁচবো।" কুলসুম তখন স্বামীর হাত দুটো চেপে ধরে অশ্রু ব্যাকুল স্বরে কাঁপা কাঁপা গলায় বলতো" ওগো, আমি যে এতো কষ্ট সইতে পারছি না। নিশিদিন অন্তরে কী যন্ত্রণাই না ভোগ করছি তা আর সামলাতে পারছি না।" মেয়ের শোকে কুলসুমের মর্মপীড়ার সীমা নেই। চেহারায় উম্মাদ উম্মাদ ভাব। এমনি করে দিনের পর দিন কাটে ওদের দুজনের।

রাতে ওরা যখন বিছানায় শুয়ে থাকে মেয়ের কথা মনে হলে কেউ কারো সাথে কথা বলে না। গুমড়ে থাকে আর চোখ দিয়ে পানি ঝড়ে। একদিন রাতে সমিরের ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখে তার শয্যাপাশ শূন্য, কুলসুম নেই। সমির ভয়ে হকচকিয়ে বিছানার উপর উঠে বসে। ভালো করে চেয়ে দেখে ঘরের দরজাটা খোলা। তখন রাত গভীর। চারদিক নির্জন নিস্তব্ধ। সমির খেয়াল করে কান পেতে শুনলো বাইরে আলো

www.pathagar.com

আঁধারে বাড়ীর আঙ্গিনায় কুলসুম বসে বসে কাঁদছে। সমির ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে স্ত্রীকে ডাকলো "কুলসুম"। কুলসুম ধীরে পায়ে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ালো। সমির বুঝলো স্ত্রী তখনও কাঁদছে। স্বামীকে দেখে কুলসুমের কান্নার অশ্রু বেগ আরও বেড়ে উঠলো। তখন তাদের দুজনের দু'জোড়া চোখে অনেক অশ্রু বিনিময় হলো। এখন তাদের কাঁদবারই সময়। গভীর রাতে তারা দু'জনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে।

সমির তার মেয়ের হাসি হাসি মুখের ছবি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। সে প্রায় মেয়ের গোরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। আপন মনে বলতে থাকে "নিরু তুই এতো স্বল্প সময়ের জন্য এসে আমাকে মর্মান্তিক বেদনা দিয়ে চলে গেলি। তুই আমার স্মৃতিপটে চিরকাল যতদিন বেঁচে আছি তত দিন তুই আমার মনের মাঝে জাগরুক থাকবি। আমার আকুল চিত্ত কস্মিনকালেও তোকে ভুলবে না। তুই নেই, আমি অসহ্য যাতনা ভোগ করছি। আজ তোর অদর্শনে কত যাতনা যে ভোগ করছি তা কেবল উপরঅলাই বুঝে। কথাগুলো বলতে বলতে তার চোখের জলে গালদুটো ভিজে উঠে। বালির বাঁধ ভাঙ্গার মত তার অশ্রুজল চেপে রাখা যেত না। দুগাল তারপর বুক পর্যন্ত তরতর করে নেমে আসে তার অশ্রুজল।

নিরু চলে গেল। বেশী দিন বাঁচলো না। স্বামী স্ত্রী ওরা দুজনেই হয়ে পড়লো আহত উড়োপাখী। নিজেদের সম্পর্কে তারা এখন কিছুই বোঝে না। তারা ঘর সংসার ছেড়ে দিয়ে বাকী দিনগুলো দুঃখের হাতে সাঁপে দিল।

মেয়ের শোকে তাদের জীবনটা খুব ছোট হয়ে এলো। বাঁচার সখ জীবন থেকে মুছে গেল। তারা নিরুকে ভুলতে পারে না। আদরের নিরুর মুখ, মুখের হাসি সমিরের হৃদয়ে জেগে উঠলে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। মেয়ের শোকে দুজনেই যেন ছন্নছাড়া হয়ে পড়লো। নিরুর মৃত্যুতে সমির ও কুলসুম দুজনে সুখের গন্ডী পেরিয়ে দুঃখের বলয়ে প্রবেশ করলো। প্রবেশ করলো এক জগৎ থেকে আর এক জগতে। তাদের সুখের পালা শেষ। শুরু হলো দুঃখের পালা। তারা বুঝে উঠতে পারেনি তাদের জীবনের হাসি আনন্দের গতি রোধ হয়ে গেল। এখন তা আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত মীমাংসার পথে প্রতীয়মান হতে যাচ্ছে। আল্লাহর বিধান বুঝার

www.pathagar.com

সাধ্য কারো নেই। নির্মম নিষ্ঠুর বলে যা মনে হয় তা মানুষের বুঝার অতীত।

এদিকে দেশে দেখা দিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পরপর দুবছর অনাবৃষ্টি। আকাশ থেকে এক ফোঁটাও বৃষ্টি এলো না। গ্রীষ্ম পীড়িত হতভাগ্য গ্রামবাসীদের ভাগ্যে বৃষ্টি নেই। গ্রামে চাষ আবাদ বন্ধ। মাঠ খাঁ খাঁ করছে। মাঠের ফলসহারা মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। জমিতে ফসল নেই। চারদিকে কেবল হাহাকার। দেশে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়লো। সমিরের ঘরে খাবার নেই। সংসারে দেখাদিল অভাব এবং ভীষণ কষ্ট। তাদের অর্ধাহারে কোন দিন অনাহারে দিন কাটে। দুঃখ কষ্টের সমস্যা সমিরের জীবনকে ঘিরে ফেললো। সমিরের জীবনে এসে গেল বড় করুণ অবস্থা।

স্বামীকে খাইয়ে রেখে কুলসুম প্রায় দিনগুলোতে উপোষ থাকে। একাজ সে বড় গোপনে করে। স্বামীকে জানতে দেয়না। তাদের সংসারে বড় টানা টানি। একদিন সমির তার স্ত্রীর খাওয়ার কথা জানতে চাইলে কুলসুম চুপ থাকে। মলিন মুখে চোখ দুটো মুছে বলে, জানোতো সবদিন সংসারে হাঁড়ি চড়ে না। আমি খেলে তুমি খাবে কি? ওগো, আমার অপরাধ নিও না। আমি না হয় না খেয়ে থাকি। বলো, তোমার পেটেই বা ক'মুঠো অন্ন জোটে?

একথা শুনে সমিরের মুখে কথা নেই। সে অবাক চোখে কুলসুমের মুখের পানে চেয়ে থেকে বললো, এসব কি বলছো কুলসুম? তুমি নাখেয়ে থাকলে অসুখে ধরবে অমন করে খিদে মেরো না। তোমার শরীরটা হচ্ছে কি? এমন ধারা অত্যাচারে বাঁচবে কদিন? তোমার কিছু হয়ে গেলে আমি সইতে পারবো না? জানি, তুমি আমার জন্য প্রাণটাও দিতে প্রস্তুত। তা বলে উপোষ থেকে নিজেকে ধ্বংস করবে? আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলো, আজ থেকে তুমি এমনটি আর কোন দিন করবে না। খেলে দুজনে খাবো, না খেতে পেয়ে দুজনে এক সাথে মরব।

স্বামীর প্রতি কুলসুমের অন্তরে ছিল মধুর ভালবাসা এবং কোমল অনুভূতি। সে স্বামীকে অনেক বড় করে দেখে। সে বড় ব্যাকুল হয়ে

www.pathagar.com

স্বামীকে বললো, ওগো। তুমি আমার ওপর এনিয়ে রাগ করোনা। তোমার সব কথা মন থেকে মেনে নিলাম।

কুলসুম স্বামীর মুখের পানে চেয়ে বিষণ্নমুখে তার হাত দুটো নিজের কোলের ওপর টেনে নিয়ে আবারো বললো, ওগো, তুমি আমার স্বামী, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই এ কাজ করেছি। তোমার জীবনের সাথে আমার জীবন যে গাথা আছে। তোমার মনে কষ্ট দিয়ে সংসারে দুঃখ আনতে চাইনা। কুলসুম চোখের জল চেপে ধরে বললো, সংসারে যে দিন যা জুটবে খেতে হলে তুমি আমি এক থালে এক সাথে পেটে দেব। কুলসুম আরও কি যেন বলতে গেল কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল

জমিদারের কাছে সমিরের তিন বছরের খাজনা বাকী পড়েছে। জমিদার একসাথে তিন বছরের বকেয়া খাজনা চেয়ে বসলো। বুঝলোনা দরিদ্র চাষীদের কথা, গোবেচারী সমিরের দৈন্যদশার কথা। অত্যাচারী জমিদার এ সবের কিছুই বুঝলো না। খাজনাপত্র আদায় না হলে জমিদারী লাটে উঠবে। তাই জমিদার আপন জায়গায় বেঁকে বসলো।

ভুস্বামী জমিদার তার অনেক দাপট। কমলপুর গ্রামের নিষ্ঠুর জমিদার একদিন সমিরের বাড়ীতে পেয়াদা পাঠালো। পিয়াদা দুজন লাটিয়াল সঙ্গে নিয়ে সমিরের বাড়ীতে এসে লাটি ঠুকেঠুকে ভয়ানক গলায় বলতে থাকে সমির আছিস?"

সমির সারা দিতে পারে না।

পিয়াদা সমিরকে গালাগালি দিয়ে বলতে থাকে, "শালা সমির ঘরে আছিস? কোন উত্তর নেই। পেয়াদা আবারও ডাকে, শালা সামির আছিস? এবারও উত্তর নেই। সমির মিয়া নিরূপায়, অসহায়।

পেয়াদার দাপট কম নয়। একেবারে মিলিটারি দাপট। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাম্ভিক প্রকাশ করতে থাকে। এবার ভূখা সমির গায়ে একটা ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পেয়াদাকে নত শিরে সালাম ঠুঁকে বলে;

"কেন, কী হয়েছে?"

www.pathagar.com

পিয়দা কড়া মেজাজে বলে, জমিদার তোকে কাছারিতে তলব করছে।

রাত থেকে সমিরের জ্বর, গা পুড়ে যাচ্ছে। সে কিছুটা বিরক্ত হয়ে পেয়াদাকে বলল, আমার শরীরটা ভাল নাই। ভীষণ জ্বর। শরীরটা কাঁপছে, দাঁড়াতে পারছি না।

সমিরের কথা শুনে পেয়াদা রাগে জ্বলে উঠলো। মুখোমুখি হয়ে দুজনের চলে কথা কাটাকাটি। অসুস্থ সমির অনুনয়ে বলতে থাকে, ফিরে যেয়ে জমিদারকে বলো, জ্বর ছাড়লেই যাব। তিনি আমাদের মনিব, তাঁর আদেশ ঠেলতে পারিনা। এতো জ্বর নিয়ে হাঁটতে পারছি না। আমাকে এখন ক্ষমা কর। কসম দিয়ে বলছি একটু ভাল বোধ করলেই যাব।

পিয়াদা কিছুই শুনলো না, বুঝলোও না। তার অসুস্থতার কথায় পেয়াদার দয়া হলো না। সমিরের কোন কথাই পেয়াদা কানে নিলনা।

চাষা সমিরের কথায় পেয়াদার মেজাজ তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। ক্রোধের জ্বালায় কটুভাষায় সমিরকে শাসিয়ে লাঠিয়ালদের ডেকে নিয়ে যাবার সময় আর একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, দরকার হলে গায়ের জোর দেখাতেও ছাড়বনা। মন দিয়ে শোন হারামজাদা, জুতিয়ে তোর বিষ ঝাড়ব। তখন দেখবি ঠনঠনে জুতোর তেজ কত। দেখবি কত মজা লাগে। ঠিক আছে, তুই বেঁকে বসলি, আমিও বেঁকে দাঁড়ালাম। মনে রাখিস আমিও মাঝির বাচ্চা। প্রতিজ্ঞা করলাম, সময় আসুক তোকে ভিটেমাটি ছাড়া করবই করব। না পারলেও করব। প্রতিজ্ঞা কখনও ভাঙ্গিনি।

অতঃপর তারা আম বাগানের ভেতর দিয়ে আলো আঁধার নির্জন কাঁচা রাস্তা ধরে কাচারি বাড়ীতে এসে থামলো। খবর পেয়ে জমিদার কাচারি বাড়ীর দেউরীতে এলে পেয়াদা হাঁপাতে হাঁপাতে সমিরের বিরুদ্ধে তার পৃথিবী উদ্ধার করে দিলো ব্যহায়ার মতো। পেয়াদা বানিয়ে বানিয়ে সমিরের উপর দোষ চাপিয়ে, রং চড়িয়ে জমিদারকে বলতে থাকে, "হুজুর সমিরের ব্যবহারে আমি বড় অপমানিত হয়েছি। তার চাষারে কথায় ভীষণ তিক্তবোধ করছি। যার সামান্য নুনভাত জোটেনা তার এতো সাহস!

www.pathagar.com

অধিক কী আর বলবো হুজুর। তার ছোট মুখে বড় কথা শুনে মনে কষ্ট পেলাম। সীমা ছাড়িয়ে কথা বলে, এতো সাহস পেল কী করে! তার মূর্তি দেখেও ভয় আসে।"

লাঠিতে ভর দিয়ে লাঠিয়াল দুটো পেয়াদার পাশে ছিল দাঁড়িয়ে। পেয়াদা লালচোখে লাঠিয়ালদের দিকে ঘার বেঁকিয়ে একবার দেখে নিল। লাঠিয়াল দুজনের পরনে হাপ প্যান্ট, হাতে লম্বা পাকা বাঁশের লাঠি। তারা লাঠিতে ভর দিয়ে গোঁফে তা দিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে থাকে "ঠিক ঠিক।"

পেয়াদার মুখে সমিরের ঔদ্ধত্য আচরণের কথাগুলো জমিদার মনোযোগ দিয়ে শুনে বাঘের মত গর্জে ওঠে। ব্যাটেরে হারামজাদা, এতো সাহস তোর। আমার হুকুম তোর কানে ঢকুলো না। ব্যাটা ছোটলোক, শিয়াল কুত্তার বাচ্চা।

জমিদার পিয়াদাকে সমিরের বাড়ীতে পুনঃপ্রেরণের আদেশ দিয়ে বললেনঃ "সমির এবারও যদি না আসে তবে তার বৌটাকে বেঁধে নিয়ে আসিস। ইচ্ছে মতো কটা দিন ফুর্তি করা যাবে। হ্যাঁ, আর বলে আসবি, সমির না এলে সে তার বিবি ফেরত পাবে না।

পিয়াদা কালবিলম্ব না করে আঙ্গুলে চুটকি বাজিয়ে ঐ দুজন লাঠিয়ালদের সাথে নিয়ে সমিরের বাড়ীতে এসে তার ভাঙ্গা দরজায় লাথি দিয়ে বলতে থাকে, "সমির বেরিয়ে আয়। শালা কুলাঙ্গার বেরিয়ে আয়।

পেয়াদার লাথালাথি হাঁকাহাঁকিতে সমিরের ভয় হয়। সে ভেতর থেকে বলে, আবার কি হলো?" আশংকা করলো হয়তো ওদের ওপর বিপদ এসে গেছে।

পিয়াদা কড়া গলায় বলে উঠলো, তোর জন্যে পাক্কা খবর আছে। জমিদার হুকুম দিয়েছে তোর কোমড়ে রশি বেঁধে নিয়ে যেতে। যদি না যাস তাহলে তোর বিবিকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে।

কুলসুমও নিরবে পিয়াদার সব কথাগুলো শুনলো। অসুস্থ সমির পিয়াদার কথা শুনে রাগে গর্জে উঠে রুখে দাঁড়ায়। বলতে থাকে, খবরদার জানানার গায়ে হাত দিবিনা। গায়ে হাত দিলে ভালো হবেনা।

www.pathagar.com

পিয়াদা বলে, তাহলে তুই কী করবি?"

সমির কাঁপা কাঁপা গলার আওয়াজ তুলে বলতে থাকে, জানানার গায়ে হাত দিলে তোকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেব।

সে কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার খুঁটিটা ধরে দাঁড়ায়। কুলসুমও কাঁদো কাঁদো হয়ে সমিরের পেছন পেছন এসে স্বামীর পাশে দাঁড়ালো।

সমির আবারও ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে থাকে তোরা চলে যা। আল্লাহর দোহাই, তোরা অমন করে বলিস নে, বলছি তো সন্ধ্যে হতেই যাব। এখন হাঁটতে পারছি না।

পেয়াদা হুকুম দিল, বাঁধ শালাকে। আর বলা কওয়া নেই, সঙ্গে সঙ্গে লাটিয়াল দুজন সমিরকে ঘরে বারান্দার খুঁটিতে বেঁধে ফেলে। পেয়াদা লাটিয়াল সর্দারের কানের কাছে ফিসফিস করে কী সব কথা বললো। আর যায় কোথা, চোখের পলকে লাঠিয়াল দুজন ঝাপটা মেরে কুলসুমের চুলের গোছা ধরে ভীষণ জোরে টেনেহেঁচড়ে নিয়ে যায়। কুলসুম আকুতি মিনতি করে তাদের হাতে পায়ে ধরতে থাকে। এতে কোন কাজ হলো না। একটা তীব্র আর্তনাদ এরপর সে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলতে থাকে "বাঁচাও বাঁচও।" কে কোথায় আছো রক্ষা করো। কত কান্নাকাটি করলো কিন্তু কে তার কথা শোনে। এরপর অসুস্থ স্বামীকে বলতে থাকে। ওগো, শীঘ্রি এসো, আমাকে বাঁচাও।

সমির নিজের চোখে চেয়েচেয়ে সবই দেখে। উত্তেজনায় সে ছট্‌ফট্ করতে থাকে। স্ত্রীর আর্তনাদের দৃশ্য দেখে সমির আর ঠিক থাকতে পারলো না। তার গায়ে পশুর মত শক্তি এসে গেল। সে ছট্‌ফট্ করতে করতে দাঁত দিয়ে বাঁধনের দড়ি কেটে ফেলে। যেই মাত্র দড়ি ছিড়ে ফেললো শরীরটা শক্ত করে লাফ দিয়ে ঘর থেকে একটা রামদা হাতে উম্মাদের মত ওদের পিছনে পিছনে ছুটতে থাকে এর মোকাবেলা করতে। মুখে তার অদ্ভুদ শব্দ। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলতে থাকে জান নেব, জানে মেরে দেব।" মুহূর্তে সমির পেয়াদার ঘাড়ের উপর কোপ বসিয়ে ধর থেকে মাথাটা মাটিতে ফেলে দেয়। এবার সে ছুটতে থাকে লাঠিয়ালদের পিছন পিছন। লাঠিয়াল দুজনে কুলসুমকে টানাহেঁচড়া করে কাছাড়ি

www.pathagar.com

বাড়িতে জমিদারের কাছে নিয়ে আসে। কুলসুমের পরনের কাপড়চোপড় ছিঁড়ে গেছে, গায়ে মাথায় কাপড় নেই। ক্ষতবিক্ষত শরীর থেকে রক্ত ঝড়ছে। মাথার চুলগুলো সব এলোমেলো। তখনও সে ঝরঝড় করে কাঁদছে এবং ভয়ে জড়সড় হয়ে থরথর করে কাঁপছে।

তারা সমিরের সব ঘটনা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে জমিদারের কাছে খুলে বললে কিছুক্ষণের মধ্যে থানা পুলিশ হয়ে গেল। থানায় সংবাদ গেল, পুলিশ এলো। পুলিশের লোকেরা সমিরকে আসামি করে পেয়াদার লাশটা গাড়ীতে তুলে নেয়। জমিদার সমিরকে পুলিশের হাতে তুলে দিল। সে ফাঁসিতে ঝুলার অপরাধ করেছে। পুলিশের লোকেরা সমিরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যায়। আইন আদালত এসে গেল। ফৌজদারী কোর্টে সমিরের বিরুদ্ধে খুনের মামলা উঠলো। কোর্টে মামলা চলতে থাকে।

কুলসুম তিনদিন পর লম্পট জমিদারের কাছ থেকে ছাড়া পেলেও তাকে সবকিছু খোয়াতে হয়েছে নরপশু জমিদারের কাছে। তার চোখে মুখে আতঙ্ক। সে এখন কার আশ্রয়ে যাবে এটাই তার প্রশ্ন। উকোশপুর গ্রামে তাকে দেখার কে আছে? প্রিয় স্বামী জেলে। স্নেহের কন্যা কবরে। সুখের সংসার রসাতলে। সে লাঞ্ছনা, ঘৃণা এবং লজ্জাশরমে ডুবে গেছে। সে তার সর্বনাশ সইতে পারলো না। পাপী মরে যাবে। মরে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। সে তার আপন মুক্তির পথ খুঁজে নিল। আগেই ঠিক করেছে আজ রাতেই সে মরবে। ঐদিন সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। আকাশে হালকা পাতলা মেঘ। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। বাইরের অবস্থা একেবারে নীরব এবং কুয়াশার মতো ঝাপসা। কুলসুম ঘরে বসে কিছুক্ষণ চিন্তা করে। তার সবই তো গেছে, এ জীবন নিয়ে সে কি করবে? সে সংকল্পে অটল। ঠিক করলো আত্মহত্যাই তার একমাত্র পথ। সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। মনের জমানো দুঃখে রাতের অন্ধকারে গলায় রশিতে ফাঁস দিয়ে সে আত্মহত্যা করলো।

পরদিন সকালে কুলসুমের আত্মহত্যার কথা গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো। সমিরের বউ গলায় দড়ি দিয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রামের ছেলে বুড়োদের ভীড় জমে গেছে। পাড়ার লোকেরা এসে কুলসুমের মৃত দেহটা নীচে নামিয়ে

www.pathagar.com

আনলো। কুলসুমের বিকৃত লাশটার দিকে চোখ পড়তে অনেকে শিউরে শিউরে উঠে। কেউ কেউ চোখের পানি মুছে বলতে থাকে, বউটা আত্মগ্লানি নিয়েই মরলো। অনেকে বলাবলি করতে থাকে ওদের সংসারটা মাটিতে মিশে গেল। আফসোস, ওদের আর কেউ থাকলো না। বউটা নিজের দুঃখে নিজেকে মেরে ফেললো। একদণ্ড কিছুই বাকী থাকলো না। কেউ কেউ বলাবলি করতে থাকে, বউটা কাঁদতে কাঁদতে দুনিয়া ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে গেল। দুঃখের ধাক্কা সইতে পারলো না।

গ্রামের জাবু মড়োলের কানেও কথাটা গেলে। কুলসুমের মৃত্যুর খবর পেয়ে জবু মড়োল পুরানো বটতলার ছায়ায় এসে দাঁড়ালো। মিনিট তিনেক চুপ থেকে হাতের ইশারায় নিকু, করু, সারের সবাইকে কাছে ডাকলো। সে তাদের কাছ থেকে কুলসুমের মৃত্যুর সব কথাই শুনলো।

মড়োল বলতে থাকে, চোখের সামনে ধবংস দেখলাম। জানো সাবের মিয়া, পৃথিবীটা বড় কঠিন জায়গা। মানুষ মানসিক শক্তি এবং ধৈর্য হারিয়ে ফেললে এমনই কিছু ঘটে যায়। তখন আর বাঁচা যায় না।

জাবু মড়োল সবাইকে উদ্দেশ্য করে আবারও ডেকে বলল, যা হবার তো হয়ে গেছে তোরা সকলে মিলে লাশের সদগতি করেদে। ওরা তিনজনেই গ্রামের কবর খোঁড়ার লোক। গ্রামের লোকের মৃত্য হলে ওরাই কবর খোঁড়ে। মড়োল নিজের ফতুয়ার পকেট থেকে পঞ্চাশটা টাকা বের করে করু মিয়ার হাতে তুলে দিয়ে বলল, তোরা কাজে চলে যা। কথা নয়, সওয়াবের কাজে লেগে পর, কাফন দাফনের আয়োজন কর। কি, কিছু বুঝলি? কাজে চলে যা। তখন ওদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো, ওকে কোথায় কবর দেব? শুনে, জাবু মড়োল বলল, কেন, তার মেয়ের গোরের পাশে ওকে কবর দিবি। এতে একযোগে সবাই সায় দিল। মেয়ের কবরের পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে কুলসুমের কবর হলো।

হালকা আলোকোজ্জ্বল ফাগুনের দুপুর। আকাশ ঘন নীল। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো মেঘ। কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুলেফুলে রৌদ্ররশ্মি চিকমিক করছে স্বর্ণলতার মতো। বসন্তের মৃদু মৃদু বাতাসে কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুলগুলো খসে খসে কুলসুমের কবরটা ঢেকে দিল।

www.pathagar.com

এদিকে কয়েক মাসের মধ্যে আদালতে সমিরের অপরাধের বিচারকার্য নিষ্পত্তি হয়ে গেল। যে দিন রায় ঘোষণা হলো সে দিন কোর্ট ভর্তি মানুষ। সকলে চাঞ্চল্যকর মামলার রায় শুনতে চায়। বিচারক তাঁর রায় পড়ে শুনালেন। তিনি রায় দিলেন। বিচারে খুনী সমিরের মৃত্যু দণ্ডের পরিবর্তে যাবৎজীবন কারাদণ্ড হল। বিচারের রায় শুনে, সমির তার স্ত্রী কুলসুমকে শেষ বারের মতো একবার দেখতে চাইলে তাকে জানিয়ে দেওয়া হলো কুলসুমের আত্মহত্যার কাহিনী। স্ত্রীর আত্মহত্যার সংবাদ শুনে সমির মর্মভেদী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সে হাউমাউ করে, কেঁদে উঠলো। পুলিশের লোকেরা সমিরের কোমড়ে মোটা রশি বেঁধে কাঠগড়া থেকে নামিয়ে টেনে নিয়ে গেল।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের আলো-অন্ধকার সেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিগত জীবনের সব কথা সমির মিয়ার মনে পড়ে। কিছুই সে ভুলেনি। মন থেকে মুছে যায়নি অতীতের যা কিছু। অতীতের সব কথা যখন মনে পরে তখন তার ভেতরটা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে। ভাবতে থাকে কিসের জন্য তার যাবৎজীবন? কী দোষ তার? সে তো কোন অন্যায় করেনি। শুধু জুলুমের প্রতিশোধ নিয়েছে। এ জন্যে তার এতো শাস্তি? তখন তার মনের ভেতরটা কষ্টের জ্বালায় ভরে ওঠে। জেলখানায় তার মানসিক জীবন ছিল পাগলের মতো।

সমির মাঝে মাঝে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সেলের গরাদ ধরে ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। তার কান্নায় মিশে থাকে স্ত্রী কন্যা হারানো ব্যাথা বেদনার কষ্ট। একটা প্রচণ্ড আঘাত। সে কখনও কখনও আপন মনে দুহাত তুলে বলতে থাকে "হে আল্লাহ, তারা আমাকে যে সাজা দিয়েছে দুঃখ নেই। তুমি ন্যায় বিচারক, আসমান জমিনের মালিক অত্যাচারী জমিদারকে কোন দিন ক্ষমা করো না।" কথাগুলো বলতে বলতে সে লোহার গরদায় মাথা ঠুকতে থাকে।

কুলসুমের মৃত্যুর বছর পাঁচেক পর উকোশপুর গ্রামে খবর এলো জেলখানার বন্দিদশায় সমিরের জীবনান্ত ঘটেছে। ধীরে ধীরে ওদের কথা আর কারো মনে থাকলো না, থাকলো না ওদের ক্ষীণতম স্মৃতিটুকু। তাদের স্মৃতি গ্রামবাসীদের মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে গেল একটা বাজে উপন্যাসের অধ্যায়ের মত।

www.pathagar.com

অপরাধী প্রেম

পাঁচটা বেজে গেছে। না, বোধ হয় সে আজ আর আসবে না। মতিন বসে বসে ভাবে। আঙ্গুলের ফাঁকে আধপোড়া সিগারেটের মিষ্টি ধোঁয়া ছেড়ে বিরক্ত হয়। মতিন ছুড়ে ফেলে দেয় ওটা।

হেমন্তের বিকেল। বেলা তরতর করে গড়িয়ে যায়। পার্কে অনেক লোক। অনেকে জোড়া মিলিয়ে ঝালমুড়ি হাতে পাশপাশি কথা বলতে বলতে পদচারনা করছে। কেউ কেউ চীনাবাদাম চিবাতে চিবাতে ঘোড়াঘুড়ি করছে এদিক ওদিক। মতিন লক্ষ্য করে জোয়ান বয়সী প্রেমিক প্রেমিকারা হাতে হাত ধরে মনের সোহাগ মিলিয়ে যৌবনের প্রেম নিবেদন করছে মুগ্ধ নয়নে রমনা বটমূলের ছায়াতলে। কেউ কেউ গাছের আড়ালে চোখে চোখ রেখে গল্প করছে, মাঝে মাঝে হাসছে। কারো প্রিয়ার হাতে বকুল ফুলের মালা। কারো খোঁপায় চাঁপা নয়তো বেলিফুল শোভা পাচ্ছে আলোবাতাসে। অতো লোকের মাঝে মতিন তার আপন জনকে দেখতে পায় না। মনমরা হয়ে বসে আছে আর মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখে। ঘড়িতে ছ'টা বাজে। সে উদ্বিগ্ন। তবে কি সত্যিই সে আজ আর আসবে না। মতিন মনে মনে ভাবে যদি সে তার বাড়ীতে যায়। কিন্তু বাড়ীতে যাওয়ার তো তার কোন কথা ছিলনা। ভাবতে ভাবতে মতিনের ভেতরটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

মতিনের মনে হয় আজকাল সে যেন একটু অন্য রকম হয়ে গেছে। ঠিক সময়ে আসে না। এলেও কেমন যেন উদাস উদাস ভাব অথচ দুএকমাস আগেও সে ছিল কত মনপাগলা। মুখে ছিল মিষ্টি হাসি, ফিটফাট চেহারা। সুকোমল যৌবনের আকর্ষণ। তার সাথে মতিনের প্রথম পরিচয়টা ছিল একটা আকস্মিক।

সেদিন মতিন তার গাড়িটা ঢাকা শহরের পূর্বপ্রান্ত থেকে ড্রাইভ করে আসছিল আজিমপুরের দিকে। গাড়িটা কম গতিতেই ছিল। এমন সময় মেডিকেল কলেজের কাছে এক তরুণীকে প্রায় ধাক্কা মেরেছিল আর কি। স্প্রীডের কাঁটাটা বিশের দাগে ছিল বলে রক্ষা। সময় মত ব্রেকটা কষতে গাড়িটা ক্যা-এ্যা শব্দ করে থেমে গেল। মেয়েটি রোড ধরেই যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

হয়তো হর্ন শুনতে পায়নি। সে ধাক্কা খেয়ে রোডের উপরে ছিটকে পড়ে। মতিন চটকরে গাড়ি থেকে নেমে এসে তাকে তুলে ধরে। মেয়েটি হতবুদ্ধি হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। হাঁটুতে ঘষা খেয়ে কিছুটা ব্যাথা পায়। ভাগ্যিস বিপত্তি ঘটেনি। এরই মধ্যে রাস্তায় বেশ ভীড় জমে গেছে। মতিন আতঙ্কে গাঢ় শ্বাস ফেলতে থাকে। ইতিমধ্যে গাড়িটা ঘিরে কয়েক জন মাস্তান গোছের ছোকরা হাতের আস্তিন গুটিয়ে রৈ রৈ শব্দে মতিনের দিকে এগিয়ে আসে।

মেয়েটির তখনও আতঙ্ক কাটেনি। তবুও সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে মারমুখো জনতার দিকে এগিয়ে যেয়ে থতমত খেয়ে বলে, "আপনারা ওঁকে দয়া করে ছেড়ে দিন, দোষ আমার। তাঁর কোন দোষ নেই। রাস্তা পার হওয়ার সময় আমি আনমনা ছিলাম। প্লিজ আপনারা চলে যান।"

জনতার মাঝে বেশ একটা চাপা গুঞ্জন শুনাগেল। কেউ কেউ বলেই ফেললো, "শালারা প্রেমিক প্রেমিকা, চল কেটেপড়ি।" তারপর দেখতে দেখতে ভীড়টা পাতলা হয়ে গেল।

মতিন বেশ লজ্জিত ও দুঃখিত। মেয়েটির দিকে এগিয়ে এসে বলে, "সত্যিই আমি দুঃখিত। মাফ করবেন। মস্তানদল থেকে আমাকে রক্ষা করলেন। এ জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।" "মনে হয় আপনি বেশ ব্যাথা পেয়েছেন। মেডিকেল কলেজে আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে। আসুন না, তাকে দিয়ে আপনার প্রাথমিক চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা করে দেই।"

"না না, তেমন কিছু না। দরকার হবে না।" এরপর মেয়েটি ফুটপাত ধরে এগিয়ে চলে।

মতিন ব্যাস্ত হয়ে বলে "শুনুন, একটু দাঁড়ান, প্লিজ। আপনি আমাকে জানে বাঁচিয়েছেন তা না হলে মস্তানরা বড় কিছু হাঙ্গামা বাঁধিয়ে আমাকে উত্তম মধ্যম মানের গণপিটুনি দিয়ে আধমরা করে ফেলতো। যদি কিছু মনে না করেন, আসুন আমার গাড়িতে নিয়ে আপনাকে রেখে আসি।"

"না না, কি যে বলেন! আমি এমনি যেতে পারবো। পায়ে হেঁটে চলার অভ্যাস আছে।

www.pathagar.com

বাধা দিয়ে মতিন বলে, "অপরাধ নেবেন না, এটা আমার কর্তব্য। আপত্তি করবেন না। প্লীজ আসুন, "আসুন, বলে মতিন গাড়ির দরজাটা খুলে দেয়, মেয়েটির মুখে আর কোন কথা না বলে মতিনের পাশে গিয়ে বসে।

মতিন গাড়িটা ছেড়ে এগুতে থাকলে রাস্তার লোকগুলো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ওদের গাড়িটার দিকে। গাড়িটা ছাড়তে গিয়ে মতিন সাবধানে মেয়েটির মুখের দিকে একবার চোখ ফেরালো। মতিন মনে মনে ভাবলো মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী।

মতিন মেয়েটিকে প্রশ্ন করে, "মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছিলেন বুঝি?"

"কেন বলুন তো?"

"না, এমনি জিজ্ঞেস করছি।"

সে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে তার স্বামীর পীড়ার কথা বলবে না এবং হাসপাতালে কেন এসেছিল এই সত্যটি সে নিজের কাছে গোপন রাখালো। পীড়িত স্বামীর সেবা শুশ্রুষা করতে প্রত্যহ সে হাসপাতালে ছুটে আসে। মেয়েটি নিজেকে সামলে নিয়ে কৌশলে লোকটির কথার উত্তর দিয়ে বলে, আমার এক আত্মীয় মেডিকেল কলেজে উঁচু ক্লাসে পড়ে। ওর সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। আগামী বছর ডাক্তারী পাশ করে বের হবে। পড়াশুনাতে বেশ ভাল। পরীক্ষার অধিক দেরী নেই।

কথার ফাঁকে মতিন তার সিগারেটের কেস থেকে একটা বেনসন সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া গিলে বলে, "জানেন, এটা আমার জীবনে প্রথম অ্যাক্সিডেন্ট, এর থেকে যে উৎরে গেছি তার জন্য উপরওয়ালা আর আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

মেয়েটিও ধীর ভাবে বলে উঠলো, "তাই বুঝি! আমার জীবনেও এটা প্রথম দুর্ঘটনা।"

বলেন কি? "বেশ মিল তো।" মতিন ঠোঁটের ফাঁকে একটু 'মৃদু হেসে বলে; "এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে কী যে হোত বলুন তো? তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হলে কি কান্ডই না বেধে যেত, আর কি বিপদেই না

www.pathagar.com

পড়তাম।

মতিন তার গাড়িতে কয়েকবার ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে মেয়েটির মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো ওর রূপযৌবন। দেখলো মুখটা যেন পূর্ণিমা চাঁদের মতো উজ্জ্বল। তারপর বলেঃ "বোধহয় একারণে আমার ওপর বিরক্ত বোধ করছেন।"

"না না, বিরক্ত হব কেন? কি যে বলেন।" বলতে বলতে মেয়েটি একটু চমক নিয়ে বলে উঠলো, "এই তো এসে গেছি। গাড়িটা থামান প্লিজ।"

মতিন আসাদ গেটের মোড়ে গাড়িটা থামিয়ে বলেঃ এখানে নামবেন?

"জ্বী, নামিয়ে দিন।

তরুণী গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললো, এখানে একটু কাজ আছে। তাই আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। আসি, আস্‌সালামু আলাইকুম" বলে, মেয়েটি হন হন করে সামনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভীড়ের মাঝে মিলিয়ে গেল।

মতিন গাড়িটা ঘুড়িয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিল। বাড়ীতে এসে মতিন তার ঘরে ঢুকে ধপ করে সোফায় বসে পড়ে। তারপর আজকের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার সাথে মেয়েটির কথা আপন মনে ভাবতে থাকে। এমন সময় দারোয়ান 'ডকুলাল' মতিন সাহেবকে সালাম দিয়ে একটা ভিজিটিং কার্ড এবং এক টুকরো কাগজ তার হাতে তুলে দেয়। মতিন দারোয়ানকে বিদায় দিয়ে কাগজ দুটোয় চোখ বুলাতে থাকে। ভিজিটিং কার্ডে লেখা আছে মোঃ আতিকুর রহমান, ১৫/২ এ, নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। অন্য কাগজটা দেখে মতিন বুঝলো এটা একটা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন। লেখা আছে ডাঃ আশরাফুল আলম এম.বি.বি.এস, (ঢাকা) এম.আর.সি.পি. (লন্ডন)।

মতিন বুঝলো এগুলো ঐ তরুণীর ব্যাগ থেকেই পড়ে গেছে।

এমন সময় মতিনের মা, আফরোজা বেগম, মতিনের ঘরে প্রবেশ করে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "বেশ বেলা হয়েছে, আয় খেয়ে

www.pathagar.com

নিবি"।

মা, একটু বসো।

কেন কিছু বলবি?

হ্যাঁ মা, কথা আছে।

খুব দরকারী কথা?

হ্যাঁ, বসো।

মতিনের মা ছেলের কাছে সোফায় বসে বললেন, বল কি বলবি!

মতিন তার মায়ের কাছে মেয়েটির সব কথা খুলে জানায়। মা একটু ভেবে বললেন, "এগুলো ঐ মেয়েটিরই হবে। সবচেয়ে বড় জরুরী তার প্রেসক্রিশনটা। এগুলো না পেলে বেচারী বিপদে পড়বে। ঠিক আছে, এখন খেয়ে নে। বিকেলে যেয়ে দিয়ে আসবি।"

মা মতিনকে জিজ্ঞেস করে "তুই এর আগে ওদের বাড়ি কখনো গিয়েছিস?"

মতিন উত্তর দেয়, না মা। ঠিকানা ধরে বাড়ীটা খুঁজে বের করে নেব।

বিকেলে মতিন ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোডে এসে দাঁড়ালো। দু'এক জনকে বাড়ীর নম্বর জিজ্ঞেস করায় কেউ কিছুই বলতে পারলো না। শেষে এক রিক্সাওয়ালা বললো, সামনের ঐ পুরোনো বাড়ীটাতে খোঁজ নিয়ে দেখুন। একটু সামনে যেতেই বাড়ীর নম্বরটা মতিনের চোখে পড়ে। মতিন বাড়ীর সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটি নামছিল সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়ির মুখে দুজনেই কাছাকাছি হয়ে চোখাচোখি হলো। মতিনের প্রথম দৃষ্টি পড়লো মেয়েটির মুখের উপর।

তরুণী হকচকিয়ে বলে উঠলো, "আরে আপনি, কী আশ্চার্য। তারপর সেও চপল চাউনিতে তাকিয়ে থাকে মতিনের মুখের দিকে।

"অবাক হলেন?" মতিন প্রশ্ন করে।

মতিন কার্ড এবং প্রেসক্রিপশনটা মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে এগুলো গাড়িতে পেয়েছি। সে মেয়েটির চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকে

www.pathagar.com

এক দৃষ্টিতে। লক্ষ্য করে তার চোখের চপল চাহনী এবং সুন্দর চেহারা আর টলটলে যৌবন। মতিন নিজের মনে বলতে থাকে, "অপূর্ব, সেই মুখ, সেই চোখ কোন ভুল নেই।" তখন মতিনের চোখের ভাষাই ছিল আলাদা। মতিন মেয়েটির দিকে আকৃষ্ট হয়ে তার প্রেমে পড়লো। শুরু হলো তার প্রেম মাদকতা।

মেয়েটি আনন্দে বলে উঠলো খুব ভাল হয়েছে। আমার এক আত্মীয়ের অসুখ। আপনি আমার অনেক উপকার করলেন। প্রেসক্রিপশনটা অনেক খুঁজেছি, শেষে আপনি পাইয়ে দিলেন। সে হাসতে হাসতে বললো ধন্যবাদ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

মতিন মেয়েটিকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিতে চায়।

তাই হয় নাকি? এসে আমার বাড়ীর গেট থেকে চলে যাবেন। তা হয়না। প্লিজ, উপরে আসুন।

মতিন উত্তর দেয়, "আজ ব্যস্ত আছি, অন্য আর একদিন আসব।"

তরুণী আবারও বলতে থাকে, "আমরা গরীব, আপনার সম্মান ক্ষুণ্ন হবে বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন?"

"কি যে বলেন, তা হবে কেন?"

তরুণী এবার মতিনকে উপরে ডেকে নেয়। মতিন মেয়েটির পীড়াপীড়ি অবহেলা করতে পারলো না। তার কথায় মুগ্ধ হয়ে মতিন মেয়েটির পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। সিঁড়ির ধাপগুলো কিছুটা উঁচু। সেই পাকিস্তান আমলের পুরোনো দুতলা বাড়ী। বাইরের দেওয়ালের রং চটে মনে হচ্ছে এটা একটা পোড়ো বাড়ী। তাই ঘরের ভেতরটা কেমন হবে মতিন তা খানিকটা আঁচ করে নিয়েছে। ঘরের ভিতর ঢুকে তার ভুল ভাংলো। দেখলো বেশ ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো গোছানো ভেতরটা। জানালার একদিকে হালকা জলপাই রংয়ের চাদর দিয়ে বিছানো একটা ছোট্ট খাট। মাথার ওপর একটা আদিকালের পাখা ঝুলছে। আর একদিকে রয়েছে একটা চেয়ার এবং পড়ার টেবিল। টেবিলের উপরটা সাজিয়ে রাখা আছে কয়েকটা বই এবং খানকয়েক বাংলা ম্যাগাজিন। মাঝখানে রাখা আছে একটা সুন্দর টেবিল ল্যাম্প।

www.pathagar.com

পাশে ফুলদানিতে বিদেশী প্লাস্টিকের এক ঝাড় সুন্দর ফুল ঘরের ভেতরটা শোভীত করে রেখেছে। আর এক দিকে এক গোছা রজনী গন্ধা শোভা পাচ্ছে। টাটকা রজনী গন্ধার গন্ধ বাতাসে ঘরের ভেতরটা উন্মাদ করে রেখেছে। দরজা জানালায় হালকা গোলাপী রংয়ের পর্দা ঝুলছে, সবুজ লতাপাতার সুন্দর ছাপ। ঘরটির ভেতর এমন সুন্দর দৃশ্য দেখবে মতিন একটু আগেও ভাবতে পারেনি। ঘরে দামী জিনিষপত্র বলতে কিছুই নেই অথচ হালকার ওপর ঘরের ভেতরটা কত সুন্দর। সুরুচি পরিপাটি, সাজানো গোছানো। মতিন দেখলো ঘরটি শোভাগন্ধে মিশে আছে। বুঝলো মেয়েটির সৌন্দর্যের অনুভূতি এবং রুচির মূল্যবোধ।

মেয়েটি এবার কি যেন চিন্তা করে আমতা আমতা ঢোক গিলে মতিনকে বলে বসলো, "আমাদের পরিচয়টা কি এখন জানতে পারি?"

মতিন ঠোঁটের ফাঁকে কিঞ্চিত হাসি দিয়ে বললো, "আমার নাম মতিন সরকার। মা আমাকে মতি বলে ডাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বছর ইংরেজীতে এম,এ ফাইনাল দেব।" কথা বলতে বলতে মতিন মেয়েটির সাথে বেশ ভাব জমিয়ে ফেললো।

মতিনও জানতে চায় মেয়েটির পরিচয়। মেয়েটি মতিনের মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে উত্তর দেয়, আমার নাম সুরাইয়া নাহার শিরিন। আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে অনার্স পাশ দিয়ে কিছুটা আর্থিক এবং পারিবারিক কারণে এম,এ ফাইনালটা আর দিতে পারিনি।

মতিন বিষণ্ন মনে বলে, "দুঃখিত, আমি খুবই দুঃখিত। কথাটা শুনে মনে কষ্ট পেলাম। আপনি বোধহয় সব সময় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন?

শিরিন সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়; "না তেমন কিছু না। মিঃ নাজমুল চৌধুরী আমাকে এ বাড়ীতে বাসের জন্য একটা ফ্লাট ছেড়ে দিয়েছেন। নামমাত্র সামান্য কিছু টাকা ভাড়া হিসেবে দিই। এভাবেই থাকি এখানে। দিনের বেলা একটা কাজটাজ মানে টিউশিয়ন করে চালিয়ে নেই। এভাবে চলে আমার ব্যর্থ জীবন। এটা কী আর জীবন, তবুও চলে যাচ্ছে কোন রকম।"

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে মতিন মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, কাল ছুটির দিন, আসুন না আমাদের বাড়ী। আপনি একজন সুরুচি পরিবারের

www.pathagar.com

তরুণী। আপনার সাথে কথা বলে বেশ ভালই লাগলো। কাল আসুন। আপত্তি করবেন না। চায়ের দাওয়াত থাকলো। মায়ের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব।

মেয়েটি রাজি হয়ে বললো, ঠিক আছে, আপত্তি থাকবে কেন? সময় পেলে আসবো। সে কোন প্রকার অনিচ্ছা প্রকাশ করলো না, এরপর সে মতিনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কী যেন একটা স্বার্থ লোভের স্বপ্ন লালসায় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

মতিন বারবার অনুরোধ জানিয়ে মেয়েটিকে বললো, আসবেন প্লিজ।

"খালি মুখে চলে যাবেন? অন্ততঃ এক কাপ চা।"

"না থাক, আজ না। অন্য আর একদিন।"

মেয়েটি এবারো বলে উঠলো ঃ আপনার স্নেহময়ী মায়ের কথা শুনে আমার খুবই ভাল লাগলো কথাগুলো বলতে বলতে তার চোখ দুটো জল ছলছল হয়ে ওঠে। সে নিজেকে সামলে দিয়ে একটু মৃদু হেসে জানতে চায় মতিনের বাড়ীর ঠিকানা। মতিন তার নিউ মার্কেটের কাছে এলিফেন্ট রোডের ঠিকানাটা লিখে শিরিনের হাতে তুলে দেয়।

মতিন তার বাবামায়ের একমাত্র সন্তান। স্কুল কলেজে পড়াশুনায় মতিনের রেজাল্ট হতো অনেক ভালো। পিতা নাসির উদ্দিন সরকার ছিলেন একজন উচ্চ ভিলাসী এবং সৌখিন ব্যক্তি। ইচ্ছা ছিলো ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়ে অক্সফোডে ভর্তি করিয়ে ব্যারিষ্টার পড়াবেন। সে সুযোগ তিনি আর পেলেন না। কয়েক বছর আগে হঠাৎ স্ট্রোক করে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তিনি ছিলেন ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের একজন নামিদামী ব্যারিস্টার। শহরের উঁচু মহলে ছিল অনেক নামডাক। টাকা পয়সাও কামিয়েছেন অনেক। মৃত্যুর পূর্বে পরিবারের জন্য রেখে গেছেন সত্তর লাখ টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স, এবং ঢাকা শহরে দুটো পাঁচতলা ফ্লাট বাড়ী। মতিন এখন এ সবের মালিক। মাসে বাড়ী ভাড়া বাবদ আয় হয় নব্বই হাজার টাকা। অতি শানশওকতে ওদের দিন চলে।

www.pathagar.com

পরদিন সকালে শিরিন উল্লাসিত মন নিয়ে মতিনের বাড়ীটার কাছাকাছি এসে বাড়ীটা চিনে নিলো। খোলা গেট দিয়ে চট করে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেলো। গেটে দারোয়ান বসা। হয়তো তার ঐ ফিটফাট চেহারা দেখে দারোয়ান কিছুই বললো না, বাধাও দিলোনা। ঐ দিন থেকে মতিনের বাড়ীতে আরম্ভ হলো শিরিনের আনাগোনা। শিরিন নিশ্চয়ই আসবে। তাকে আসতে বলা হয়েছে। এটা তার অধিকার। সেই অধিকার নিয়েই সে আসবে।

শিরিন একটা ছেলেকে ডেকে বললো, "মতিন সাহেবের কাছে এসেছি।" ছেলেটা মেয়েটিকে সাথে নিয়ে তিন তলার ড্রইং রুমে বসতে বললো। শিরিনের মনে হলো ছেলেটি বেশ চট্‌পটে এবং হুশিয়ারও বটে।

মতিন শিরিনকে দেখে খুব খুশী। ড্রইংরুমে বসিয়ে রেখে মতিন তার মায়ের সাথে শিরিনের পরিচয় করিয়ে দেয়। মতিনের মা ড্রইংরুমে এলে শিরিন তাড়াতাড়ি সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পা ছুয়ে সালাম করে। তিনি একটা স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে কোমল কণ্ঠে বলতে থাকেন "থাক থাক মা সালাম করতে হবে না। বেঁচে থাকো, দোয়া করি। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। বসো মা বসো।"

মতিন বলে, মা, প্রেসিক্রিপশনটা গাড়িতে ফেলে গিয়ে ছিল সেই মেয়েটি। তুমি কথা বলো। মতিন শিরিনকে মায়ের সাথে আলাপ করতে বসিয়ে রেখে চলে গেল।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি ওগুলোর জন্য বেশ চিন্তায় ছিলে, তাই না?

মেয়েটি একটু লাজুক লাজুক হয়ে বলে, কিছুটা অবিশ্যি। আপনার ছেলেই তো চিন্তা থেকে আমাকে উদ্ধার করলো।

মতিনের মা স্নেহকণ্ঠে মেয়েটিকে এভাবে আহবান করলেন। প্রথম পরিচয়ের দিনেই মেয়েটিকে মতিনের মায়ের বেশ ভালোই লাগলো। সে সৌজন্য বোধে অমায়িক। মতিনের মা তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আলাপের মাঝে আঁচ করে নিল। মনে হলো মেয়েটা বেশ গোছালো। চাউনি দিয়ে বুঝতে অসুবিধা হয়নি মতিনের মায়ের। মেয়েটির ব্যবহারে কোথাও খুঁত ছিল না। তার মিষ্টিমিষ্টি কথা মতিনের মাকে মুগ্ধ করে।

www.pathagar.com

মতিনের মা দেখলো মেয়েটির সুন্দর চেহারা। দেখতেও বেশ পুতুল পুতুল সৌন্দর্য এবং অদ্ভুতরূপ। সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারে সুন্দর করে। কয়েক মিনিটের আলাপে মতিনের মায়ের মনে হলো সে আধুনিক কালের মেয়েদের মতোই বেশ বুদ্ধিমতি।

শিরিন কোন কথা না বলে সোফায় বসে গেল। মাথার ওপর বনবন করে পাখা ঘুরছে। আলাপের ফাঁকে কাজের মেয়ে ট্রে সাজিয়ে আপেল, আঙ্গুর আর একটা প্লেটে ছাড়ানো কিছু কমলা টেবিলে রেখে চলে গেল।

খাও মা, একটু মুখে দাও।

কথার মাঝে মতিনের মা জানতে চায় মেয়েটির কে কে আছে। শিরিন একটু চুপ থেকে বেদনা সজল নয়নে আস্তে আস্তে বলতে থাকে, আমার বাবা মা এবং প্রিয়জন বলতে তিন কুলে কেউ নেই। মেয়েটি আবারো বলতে থাকে।

অনেক দিন পর মায়ের মত স্নেহ পেলাম আপনার কাছে। সে অন্যদিকে তাকিয়ে মুখটা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ থাকলো। কথাটা শুনে মতিনের মা চমকে ওঠে।

মতিনের মা এবার জানতে চায় মেয়েটির বাবা মায়ের মৃত্যুর কথা। শিরিন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শোকতপ্ত কণ্ঠে বলতে থাকে, জানেন খালাম্মা, বাবা মায়ের কথা খুব একটা মনে পড়ে না। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম খুব ছোট। বাবামায়ের একমাত্র আদরের কন্যা। শুনেছি বাবা পাকিস্তান আমলে সরকারি অফিসে একজন বড় কর্মকর্তা ছিলেন। একাত্তরের কোন একদিন সকালে মুখোসধারী কয়েকজন রাজাকার বাসায় এসে আমাকে হুঙ্কারে স্তব্ধ করে দেয়। আমার চোখের সামনে তারা অস্ত্রের টিগার টেনে দিতেই ঝাঁক ঝাঁক বুলেট বাবামায়ের দেহটা ঝাঁজরা করে দেয়। ফিনকি দিয়ে বের হওয়া রক্তে ঘরের মেঝেটা ডুবে যায়। তারা হত্যা করে চলে গেল। দেখলাম রক্ত আর মৃত্যু। বাবা মায়ের রক্তাক্ত দেহ দুটো রক্তের উপরে পরে থাকলো। আমিও এক পুকুর রক্তের মাঝে বসে বসে কাঁদছিলাম। জন্মের মত সব শেষ। শুধু এটুকুই মনে আছে। আর কিছু জানি না।

www.pathagar.com

শিরিন কাঁদো কাঁদো হয়ে আরও বলতে থাকে, এতিমখানায় শুনেছি আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী। এখানে পালিত হয়েছি, এখানেই বড় হয়েছি। তারা লেখাপড়া শিখিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে অনার্স পাশ করিয়েছে। এতিমখানার এক এতিম যুবককে লেখাপড়া শিখিয়ে স্কুল মাস্টারীতে চাকরি দিয়ে তার সাথে আমার বিয়ে দেয়। আমার কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন আছে কিনা আজও তা জানি না। শিরিন এর বেশী কিছু আর না বলে চুপ হয়ে যায়।

শিরিনের কাছে তার দুঃখের কথা শুনে মতিনের মায়ের চোখের পানি এলো। একাত্তরের ভয়াল দিনের কথাগুলো মতিনের মায়েরও স্পষ্ট মনে আছে। রাজাকারদের মানুষ হত্যার নিষ্ঠুর কাহিনীর অনেক কথা মতিনের মাকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি শিরিনকে বলতে থাকেন, আমি একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেখেছি তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে সারাদেশটা হয়ে ছিল জনশূন্য। দেশটা ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ধনী গরীব, যুবক বৃদ্ধ সকলেই তাদের অত্যাচারে দেশত্যাগ করে যে যেদিকে পেরেছে জানে বাঁচার জন্যে আশ্রয় নিয়েছে। আলবদর রাজাকাররা হত্যা উম্মাদনায় মত্ত হয়ে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে নির্বিচারে। পিতার সামনে পুত্রকে, পুত্রের সামনে পিতাকে, স্ত্রীর সামনে স্বামীকে নির্মমভাবে করেছে হত্যা। হত্যাযজ্ঞ চলছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। ঘর থেকে স্ত্রী কন্যাদের জোর করে ধরে নিয়ে সম্ভ্রমহানির পর তাদেরও করেছে হত্যা। ন'মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অত্যাচারের কালোছায়া নেমে আসে দেশ জুড়ে।

আফরোজা বেগম এবার শিরিনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আহা মা দুঃখ করো না। সব দুঃখকে বুকে রেখেই বাঁচতে হয়। বাবা মা কারো চিরদিন বাঁচে না। দুঃখ করে কী হবে? বহু কিছুই তো ঘটে গেছে। মনে বল সঞ্চয় করো। মনোবল মানুষকে বাঁচতে শেখায়। বলতে কি, ঐ প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকে মতিনের মা শিরিনের কাছে নিজের লোক হয়ে গেল।

মেয়েটির কাছে তার বাবা মায়ের কথা উঠলে ভেতরটা বিষণ্নতায় ভরে ওঠে। তখন সে তাঁর বাবা মায়ের লোমহর্ষক হত্যাকান্ডের আতঙ্কে

www.pathagar.com

বড়ই ভীষণ হয়ে পড়ে। এই করুণ দৃশ্য আজও শিরিনের মন থেকে বিস্মৃতি হয়নি। একথা মনে হলে ভীতিতে শিরিনের ভেতরটা কাঁপতে থাকে। অসহ্য কষ্ট তার বুকের মাঝে চেপে আছে।

মতিনের মা শিরিনকে বললেন, খাও মা, আমি মতিনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বলে, ধীর পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে পাশের ঘরে ছেলেকে ডেকে বললো, জানিস মেয়েটি যেমন ভদ্র তেমন অমায়িক। কত সুন্দর ওর কথাবার্তা। বেদনায় ভরা ওর ভেতরটা। দৈন্যদুর্দশার চরমে ওর জীবন। মেয়েটি জল ছলছল নয়নে আমাকে খালামা বলে ডাকায় মনটা ভরে গেল। আহা ভাগ্য দোষে বেচারী কত অসহায়!"

"থাক, থাক মা, বড্ড হয়েছে, অত প্রশংসা নাইবা করলে। প্রথম দেখাতেই বরফগলা হয়ে গলে গেলে। তোমার তো কোন মেয়ে নেই। কেউ তোমাকে মা ডাকলে হৃদয় বিগলিত হয়ে পড়ো।

মতিন জানে শিরিন কুমারী। তার মা জানে শিরিন অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী। কুমারী এবং শাস্ত্রপানি এ দুয়ের মাঝে রহস্য অভেদ্য থেকে গেল মা ও ছেলের মাঝে।

যৌবনা শিরিন সোফায় বসে মনে মনে ভাবতে থাকে মতিন বড়লোকের ছেলে। ঢাকা শহরে বিরাট পাঁচতলা দালান বাড়ির মত বাড়ি। সবই চমৎকার। চাকর চাকরানী সারা বাড়িটা জমজমাট করে রেখেছে। বাড়ীর এক পাশে কুঞ্জবনের মতো সাজানো দেশী বিদেশী ফুল বাগান। বাগানটা ফুলে ফুলে ভরা। নানা রংয়ের ফুল ফুটে আছে। হলুদ, টকটকে লাল, গাঢ় নীল। দেখতে বড়ই সুন্দর। দেখাশুনার জন্য বাগানে কাজ করছে রোস্তম আলী নামে একজন মালি। আর একদিকে সবুজ ঘাসের লন। বাড়ীটার চারদিক উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। প্রবেশ পথে লৌহকপাট সুন্দর গেট। গেটে পাহাড়া দিচ্ছে একজন গুর্খা দারোয়ান। দেয়ালের ধারগুলোতে রঙ্গিন মার্বেল পাথরে ঢাকা। দেখতে চমৎকার। মতিনের মা একজন স্নেহময়ী মহিলা, মনটা কত নরম। এতো সব ভাবতে শিরিনের অবাক লাগে।

মতিনের বাড়ীর উন্নত এবং আধুনিক পরিবেশের মায়াজালে শিরিন নিজেকে জড়িয়ে ফেললো। সে এখন নিরাসক্ত নয় মোহে আসক্ত হয়ে

www.pathagar.com

পড়লো। সে মন বেঁধে সংকল্প করলো কি ভাবে দারুন হয়ে ফায়দা লুটবে।

পাশের ঘর থেকে মতিন ড্রয়িংরুমে এসে শিরিনের কাছে জানতে চায় তার মাকে কেমন লাগলো।

শিরিন উত্তর দেয় "চমৎকার। আপনার মায়ের সাথে আলাপ করে নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে করি। সত্যি, তিনি একজন স্নেহময়ী জননী। আজ যদি আমারও মা থাকতো" বলতে বলতে শিরিনের দু'চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে জমাট অশ্রু গড়িয়ে এলো।

মতিন তার রুমাল দিয়ে শিরিনের অশ্রুভরা চোখ দুটো মুছে দিতে যেয়ে কী যেন ভেবে অলক্ষ্যের ইশারায় হাতটা গুটিয়ে নেয়। লজ্জাসরম হিতাহিত জ্ঞান সবাই তো হারিয়ে ফেলে না। তাই মতিন শশব্যস্ত হয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, শিরিন, সহজ হয়ে নিজেকে সব কিছুতে এ্যাডযাস্ট করে নেবে। দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। তখন তুমি আর চিন্তা বোধ করবে না এবং তোমার দুঃখী দুঃখী ভাবও থাকবেনা। মন খারাপ করো না। ভালো না লাগলে চলে আসবে। যে কোনো সময়ে চলে আসবে। শিরিন এই সুযোগ নিতে রাজি। এতে তার দ্বিধা অপরাধ বোধের কিছুই নাই।

বিদায় নেবার আগে শিরিন বললো, সময়ের বড় অভাব। যাবার সময় সে মনে মনে বলেছিল- নিশ্চয় আসবো, অনুরোধ না করলেও আসবো। কথা বলতে বলতে শিরিনের মুখের উপর মতিনের একটা ক্ষুধার্ত দৃষ্টি পড়ে।

শিরিন মতিনের তাকানো দৃষ্টিটুকু এড়াতে পারলো না। সে মতিনের চোখের ভাষা বুঝলো। কি বলবে, কি করবে ভেবে পায় না। যৌবন এবং ভোগ এ দুটোর মাঝে মতিনের চাওয়া পাওয়ার ঝোঁক। শিরিনের চোখে তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। বুঝতে কিছুই ভুল হয়নি শিরিনের। মতিনের ছেলেমানুষী কাণ্ড তার মনের মাঝে গোপন রেখে নিজেকে সামলে নেয়।

শিরিন তার যাদুর চোখে মতিনের মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে এক লুব্ধ ভবিষ্যতের আশায়। শিরিন মনে মনে ভাবে মতিন টাকার কুমীর। তার অভাবকে দূর করতে হলে যা যা করা দরকার

www.pathagar.com

মতিনের কাছে সে তাই করবে। তাতে শিরিনের আশংকার কিছু নেই। সে জোর করে নিতে জানে। শিরিন তার অশান্তির মাঝে শান্তি খুঁজে পেল।

এতোক্ষণে একটা পরিকল্পনা চলে এলো ওর মাথায়। সে অদ্ভূত এক প্রেম চাতুরীর চাল চালতে প্রস্তুত হয়ে গেল। এ ছল মতিনের কাছে যেন ধরা না পড়ে। শিরিন মনে মনে ভাবে জীবনে একটু আধটু নাটক থাকা ভাল। সে ঠিক করলো নাটকের সবকটা প্রেমপর্ব মতিনের কাছে খুব সতর্ক হয়ে অভিনয় করবে। সে জানে তার অভিনয় করার ক্ষমতা অনেক বেশী। কি করে কী করতে হবে শিরিন তার মতলব এঁটে নিলো। প্রয়োজনে সে সব কিছুই শক্ত হাতে সামলে নেবে। শিরিন তার স্বামীর চিকিৎসার অর্থের জন্য উঠে পড়ে লাগলো।

মতিন শিরিনের যৌবনের চাকচিক্য এবং স্মার্টভঙ্গি দেখে তার প্রেমখেলা শুরু করে দিলো। প্রেমশোভিত হয়ে সে শিরিনকে জীবনের কেন্দ্র পর্যন্ত টেনে নিতে চায়। এভাবে মতিনের মাঝে চলতে থাকে মঙ্গল কাব্য কাহিনীর মতো চিত্তচাঞ্চল্য নাটক।

মতিনের মনের আকাঙ্ক্ষা মিটাবার সাধ শিরিনের নেই। তাকে ভালোবাসার লোক আছে। শিরিন একটা উদ্দীপনার আশায় মতিনকে কামনা করেছে। শিরিন তার রুগ্ন স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্য মতিনকে চেয়েছে। মতিনের জীবন থেকে রস টেনে নিয়ে শিরিন শক্তিশালী হতে চেয়েছে তার স্বামীকে সুস্থ করার জন্যে। মতিনকে নির্বোধ বানিয়ে টাকা আদায় করবে তার স্বামীর চিকিৎসার জন্য। কেবল টাকার জন্যই শিরিন মতিনকে টার্গেট করেছে।

শিরিন প্রায় হুটহাট করে চলে আসে মতিনের বাড়ীতে। তারপর মতিনের সাথে বের হয় ছলনার অভিসারে। কোন দিন মিরপুর চিড়িয়াখানা, কোনদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে আবার কোনদিন শিশুপার্কে। এভাবে তারা ঢাকার নিভৃত অঞ্চলে অঞ্চলে ভ্রমণ করে ঘুরে বেড়ায়। শিরিনও মতিনের সাথে অবাধ বিচরণে সবকিছু মুখ বুজে গ্রহণ করে নিয়েছে তার স্বামীর স্বার্থে। শিরিন প্রবঞ্চনা দিয়ে মতিনকে বসে এনে তার কাছ থেকে অর্থ পাবার প্রয়াসে মিথ্যা প্রেমের অভিনয় করতে

www.pathagar.com

থাকে। শিরিনের হাসিমাখা কথায় মতিন কোন দিন বুঝতে পারেনি সে তার সাথে প্রবঞ্চনার অভিনয় করে চলছে। তার চোখেমুখে সব সময় ছলনার আভাস। মতিন তা টের পায় না।

একদিন বিকেলে মতিন দেখলো রমনা পার্কের একটা বেঞ্চে শিরিন মন ভারী করে গুমরা মুখে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। সে মুখ তুললো না। গম্ভীর। মতিন পাশে দাঁড়িয়ে শিরিনকে ডাকলে সাড়া দেয় না। হাঁ-না কিছুই বলে না। ঘাড়ের উপর থেকে মতিনের হাতটা সড়িয়ে দেয় শিরিন। মতিন কিন্তু শিরিনের হাতটা ছুঁয়ে ভালবাসার আনন্দ পেতে চায়। এবারও একটু দূরে সড়ে বসে শিরিন। মতিন খুব কাছে এলে তাকে সতর্ক থাকতে হয়। কারণ শিরিন জানে মতিন বড্ড গায়ে পড়া, নাগালের মধ্যে থাকলে হয়তো আবারো গায়ে হাত বাড়াবে। কখন কি অপকীর্তি না করে বসে। সাহস তো তার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

মতিন এবার শিরিনের সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখে হালকা হাসি দিয়ে বলে, কথা বলছ না, চুপ করে আছ, কি ভাবছো, বলো তো?

শিরিন তার মাথার ঘন চুলের ভেতর থেকে কয়েকটা আলগোছ চুল আঙুল দিয়ে কপাল থেকে সরিয়ে নিয়ে বিষণ্ন সুরে বলে, মনটা ভাল নেই। অসুবিধায় আছি। সমস্যায় পড়েছি।

তাজ্জাব ব্যাপার খুলে বলো। না বললে সমস্যা দূর হবে কি ভাবে? ঘাবরিও না। তুমি তো জানো, আমি সরল সোজা মানুষ। ট্যারাব্যাকা কথা পছন্দ করি না। বলো কি হয়েছে?

তোমাকে বলতে সাহস হচ্ছে না।

তুমি কী আমাকে ভয় পাও? সাহস করে বলো সমস্যা থাকবে না। মনের অনুভূতি দিয়ে সমস্যা ব্যাক্ত করতে হয়। এতে দুঃখ কষ্টের জ্বালা দূর হয়। কারো কাছে কিছু পেতে হলে তার কাছে যেতে হয়। তবেই তা পাওয়া যায়। দূরকে কাছে পেতে হলে সেই দূরে যেতে হয়। তখন সেই দূর কাছে এসে যায়। জানো শিরিন, আমি এখন তোমার অনেক কাছের মানুষ। কাছের মানুষেরাই হয় আপন জন। হৃদয়ের জোরেই মানুষ সহজে আপন হয়ে যায়। জীবনকে অতো ভাররোধ করোনা। বলো, তোমার কী

www.pathagar.com

হয়েছে? মতিন প্রশ্ন করে জানতে চায়। শিরিন মতিনের কথাগুলো উপদেশের মতো মন দিয়ে শুনলো।

তারপর একটু ম্লান হেসে মতিনকে বললো "জানো, আমার বেশ কিছু টাকার দরকার। কোথায় পাই বলতো? জানো মতিন, জীবনের বড় বড় সমস্যা অনেক সময় অনায়াসে সমাধান হয়ে যায় অথচ ছোটখাটো ব্যাপারে মুক্তির পথ খুঁজতে মানুষ হিমশীম খায়। এই ছোট মাপের সমস্যাটা আমাকে মুস্কিলের দিকে টেনে নিচ্ছে। আমাকে বড় ব্যাকুল করে রেখেছে। বুদ্ধি বিবেচনাও যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন সময় এমন সব সময় আসে যেন কাটতে চায় না।

আমি তো আছি "খুলে বলো, সমস্যাটা কোথায়? এতে তোমার দ্বিধা সন্দেহের কোন কারণ নেই। মতিন আশ্বাস দেয়।

সে শিরিনকে আবারও বলতে থাকে, সমস্যায় কখনও মুশরে পড়ো না। তোমার টাকার অঙ্কটা বলো কত হলে তোমার সমস্যা মিটবে। আমাকে কখনও কঠিন মনে করোনা। বলো, কত টাকা হলে তোমার সংকট কাটবে?

কেন, তুমি কি দেবে?

ঠিক আছে, দেব। বল কত দরকার।

দশ হাজার হলেই চলবে।

এতে হবে?

হাঁ হবে।

ঠিক আছে, বলে মতিন তার ব্যাংকের এ্যাকাউন্ট থেকে দশ হাজার টাকার একটা চেক লিখে শিরিনের হাতে দেয়। ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে শিরিন চেকটা তার মধ্যে রেখে দেয়। মতিনের মুখের দিকে তাকিয়ে শিরিন একটু কোমল হাসি দিয়ে বলে সত্যি তুমি খুব চমৎকার মানুষ। শিরিন মতিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে থাকলো একটা মুহূর্ত।

মতিন গম্ভীর চোখে তাকিয়ে বলে, ঠিক না, ভুল ধারণা। মতিন আর কিছু বলে না। শিরিন দেখলো মতিনের ঠোঁটে একটা অস্পষ্ট হাসির রেখা।

www.pathagar.com

মতিনের মনটা সেজে আছে পাগলা ঘোড়ার মত। শিরিন মতিনের পাগলামী টের পায় কিন্তু মুখে কিছু বলে না। শিরিন ভালই বোঝে মতিন সৌন্দর্য ভোগের নেশায় পাগল। সে শিরিনের কাছে প্রেমের পরশ চায়। সব সময় মতিনের চোখেমুখে নারী টেনশন চনমন করে। তার মন জুড়ে থাকবে কেবল শিরিন আর শিরিন। শিরিনের রূপযৌবন মতিনকে উন্মাদ করে রেখেছে। মতিনের কাছে সে শুধু শিরিন নয়। ভালোবাসার সুপ্রিয়।

অবৈধ কিছু দেবার মত শিরিনের চরিত্রে নেই। নারী হচ্ছে পুরুষের সঙ্গিনী এবং ঐ নারীর মধ্যে যদি জননীর ভাব এসে যায় তাহলে তার প্রেমিক তাকে আর সেভাবে পায় না। শিরিন যা কিছু করে তার স্বামীর চিকিৎসার জন্য করে। মতিন টের পায় না। ভালোবাসায় প্রেম ও মমতা না থাকলে সেই ভালবাসায় কখনই পূর্ণতা আসে না। মতিন তা বুঝে উঠতে পারেনি।

শিরিন তার চতুর বুদ্ধি নিয়ে মতিনের মনের দুর্বলতা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে। বুঝে নিয়েছে প্রেম ভালোবাসা জিনিষটা কখনও দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করে মূল্যায়ন করার বস্তু নয়। শিরিনের জীবনে শুরু হয়ে গেল লুকোচুরি খেলার সূত্রপাত। ভালোবাসার অন্তরালে শিরিন খেলতে থাকে এক অন্তর্ভেদী প্রণয়। এ প্রেম শিরী ফরহাদ কিংবা লায়লী মজনুর প্রেম নয়। এ প্রেমে নাই রমণীর ঐকতান, নাই গর্বের অধিকার কিংবা স্বর্গের অপ্সরীর মতো সুধা পানের পুণ্যচিত্ত। শিরিনের প্রেমে আছে অঞ্জন চোখে ছলনার দৃষ্টি। আছে মিথ্যা প্রণয়। তার প্রেমের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অদৃশ্য গতি।

মেয়েরা ভালোবাসে পুরুষের অর্থের জন্য ধন সম্পদ ও প্রতিপত্তির জন্য এবং ছেলেরা ভালোবাসে মেয়েদের রূপের জন্যে। রূপের জন্যেই শিরিন মতিনের ভালোবাসা পেয়েছে। এখানেই শিরিনের জিত। ছেলেরা মেয়েদের রূপের প্রয়োজন যতটা বোঝে নারী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন অতটা বোঝে না। পুরুষের ভালোবাসায় থাকে আনন্দ যা জীবনকে করে তোলে ছন্দময়।

মাস খানেক পর একটা মিষ্টি বিকেলে আবারও তারা দুজন দুজনে বোটানিকেল গার্ডেনে একটা গাছের ছায়ায় বসে বসে গল্প করছিল।

www.pathagar.com

শিরিনের গল্পে লুকিয়ে থাকে হীনরুচি মনের আভাস। মতিন অভিমানী শিরিনের মুখের দিকে চোখদুটো মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শিরিনের চোখমুখের অবস্থা দেখে মতিন কিছুটা আঁচ করে নিল তার ভেতরের ইচ্ছাটা। সে শিরিনকে এতোদিনের মধ্যে ভাল করে বুঝে নিয়েছে।

মতিন সোজাসুজি তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে কিছুটা আনমনে চুপ থাকলো হতবুদ্ধির মত।

শিরিন মতিনকে কোন দিন মন দিতে পারেনি। কারণ সে তার প্রেমে পড়েনি। মতিন কিন্তু শিরিন ছাড়া কিছুই বোঝে না। ওকে কাছে পেলে মতিন যেন উম্মাদ হয়ে দুনিয়া ভুলে যায়। শিরিনের নামে মতিন পাগল। মতিন শিরিনকে তার সব কিছু দেখলে ওলট্‌পাল্‌ট হয়ে যায়। সে তার ভালোবাসার প্রাচুর্য নিয়ে শিরিনের কোমল হাতটা স্পর্শ করে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আবারও কোন সমস্যায় আছ?

শিরিন একটু চমকে উঠে। কি যেন সে ভাবে। একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দুর্বল গলায় বলে, হাঁন তুমি ঠিকই ধরেছ, আমি নিরূপায়। যদি মাইন্ড না কর আমাকে একটু হেলফ কর।

শিরিন ভালোকরেই বোঝে মতিনের ভালোবাসায় নেই কোন আবর্জনা। তবুও কথাটা বলতে যেয়ে শিরিনের মনে একটু খট্‌কা হ'ল পাছে মতিন যদি না করে।

মতিন শিরিনকে তার ভালোবাসার মন নিয়ে বলে, "তুমি আমার কাছে হীরা, জহরৎ চাইবে না। সমস্যা থেকে মুক্তির জন্যে সামান্য কিছু টাকা ছাড়া আর কী চাইবে, বলো?

শিরিন পাংশুমুখে একটু হাসি দিয়ে বলে বসলো, তুমি ঠিকই ধরেছো, আমার আবারও কিছু টাকার প্রয়োজন। শিরিন কাঁপা কাঁপা সুরে মতিনকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি দেবে? মতিন একটু চুপ থেকে বলল, বলছি তো দেব, বল কত চাও?

এবারও হাজার দশেক।

মানে দশ হাজার, এতে হবে তো?

হ্যাঁ হবে।

www.pathagar.com

মতিন একটুও আপত্তি করলো না। শুধু মাথা নেড়ে বললো, আচ্ছা নিও। এটুকু সে ভালোই বোঝে প্রেম করলে প্রেমিকাকে সব সময় খুশিতে রাখতে হয়। টাকা না পেলে বিগরিয়ে যাবে। তখন তার মান ভাঙ্গাতে হবে।

কথা ঘুরিয়ে শিরিন আবারও বললো, সত্যি বলছ? এমন না যে তোমার কথা অবিশ্বাস করছি। তবে-।

তবে কি?

না, কিছু না। নিজের কাছে খারাপ লাগছে। তোমাকে বলতেও লজ্জা আসে। তবুও না বলে পারলাম না।

এখন শিরিনের ভেতরটা শান্ত হলো। সে মুখ তুলে মতিনের দিকে তাকালো একবার।

মতিন আর কিছু না বলে এবারও তাকে দশ হাজার টাকার একটা চেক লিখে দিয়ে বলল, চলো ফিরে যাই, সন্ধ্যা কাছাকাছি ঘনিয়ে আসছে। এখন ঘুরে বেড়াবার সময় না। আবার দেখা হবে বলে বাগানের একটা তাজা ফুল শিরিনের হাতে তুলে দেয়। এরপর তারা পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

শিরিন এভাবে প্রেমের অভিনয় করে মতিনের কাছে থেকে মাঝে মাঝে টাকা নেয় দশ হাজার, পাঁচ হাজার, আবার কখনও তিন হাজার। শিরিন মতিনের কাছে হয়ে পড়েছে বিধাতার আশীর্বাদ। তা না হলে এতো সহানুভূতি, এতো আন্তরিকতা পাবেই বা কেন? শিরিন মনে মনে শতমুখে বলতে থাকে সবই বিধাতার ইচ্ছা।

শিরিন মতিনের কাছে হয়ে পড়েছে আদরের বস্তু, হৃদয়ের ভূষণ, সখের জিনিষ। এমনি করে দেখতে দেখতে তাদের একটা বছর কেটে যায়।

শিরিন দিনের পর দিন মতিনের কাছে বঞ্চনার লুকোচুরি খেলা খেলেই চলেছে। শিরিনের অর্থ লালসা পরিচালিত হতে থাকে তার রুগ্ন পতিদেবতার জীবন রক্ষার জন্যে। মতিন এসবের কিছুই জানে না, বোঝেও না, বোঝে তার বিধাতা।

www.pathagar.com

মতিনের কাতর হৃদয় সব সময় অতৃপ্ত বাসনায় শিরিনের জন্যে খাখা করে ওঠে। কারণ সে শিরিনকে ভালোবাসে। ভালাবোসে উৎফুল্ল চিত্তে, সরল হৃদয়ে। দুটো নদী যেমন একত্রে মিলিত হয়ে গড়ে তোলে সঙ্গমস্থল তেমনি মতিনও তাদের দুটো হৃদয়নদীকে একত্র করে গড়ে তুলতে চায় বিবি বিলাস স্থল।

শিরিন আগের মতো মতিনের কাছে আসে না। সে লক্ষ্য করে শিরিন আজকাল অনেকটা তফাতে তফাতে চলে ফিরে বেড়ায়। সে উৎকণ্ঠায় বিনিদ্রা রজনী যাপন করে। রাতে ঘুমের লেশ থাকে না। মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে কী যেন সব ভাবতে থাকে। যখন তখন সে তার তিন তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোলাটে মন নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কোন কাজে মন বসে না।

সামনে এম.এ. ফাইনাল পরীক্ষা। সেদিকে মতিনের কোন খেয়াল নেই। শিরিনের জন্য তার লেখাপড়া শিকেয় উঠেছে। জীবনের সাথে জীবন যোগ না হলে জীবন পূর্ণ হয় না এই সত্যটা শিরিনকে কয়েক বার বলার চেষ্টা করেও মতিনের মুখ ফোটেনি। সে সব সময় তার প্রেম ভারে চিন্তিত। মানুষ যেটা চায় সব সময় সেটা পায় না। না পাওয়ায় ওটাই হয় তার অশান্তির কারণ। না পাওয়ার অস্বস্তিতে মতিনের ভেতরটা ছেয়ে আছে। তার মাথায় যন্ত্রনা, কপালের দু'পাশে শিরা দীপদীপ করে। ভেতরের অস্থিরতা বাড়ছেই বাড়ছে। ভেবে কিছু ঠিক করতেও পারে না।

মতিন অশান্ত মন নিয়ে বিরক্ত হয়। হতাশ মনে খালি খালি ভাবতে থাকে। আজকাল শিরিন আগের মতো তার কাছে আসে না। অনেক দিন থেকে তার কোন সংবাদও নাই। তাহলে সে কি আরও টাকার জন্য অন্য কোথাও হাত পাতলো। না কি পলাতক রাজদ্রোহীর মতো কোথাও আত্মগোপান করলো। না কি তার প্রেম ভান্ডার অন্য কোথাও লুণ্ঠিত হলো।

মতিন আপন মনে বলতে থাকে, তাকে আমি প্রেম এবং করুণা দুটোই দিয়েছি। কষ্টে পড়েছে উদ্ধার করেছি। নানাভাবে উপকার করেছি। কোন দিন অসম্মান করিনি। সে আমার স্বপ্নলোকের ঘরসংসার। আমার জীবনের আলোকরশ্মি। আমার গগণ মানসে বেদনার আগুন জ্বেলে অন্য

www.pathagar.com

কারো অনুগামনী হবে একথা বিশ্বাস করি না। আর একজন এই মেয়েকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে এও আমি বিশ্বাস করি না। মতিন এভাবে অনেক কিছু আবোলতাবোল ভাবতে থাকে আপন মনে।

স্বামীর চিকিৎসার জন্য মতিনের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের আগ্রহ শিরিনের আর নেই। ডাক্তার সাহেব রুগীর অবস্থা সম্পর্কে শিরিনকে সব জানিয়ে দিয়েছে। ডাক্তার সাহেব জবাব দিয়ে বলে দিয়েছে চিকিৎসায় আর কোন কাজ হবে না সুতরাং করার আর কিছুই নেই। তাদের সব চেষ্টা শেষ। আর মাত্র কয়েকটা দিন।

স্বামীর এরূপ অবস্থায় শিরিন বড় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তার ভেতরে হতাশার ঝড় বইছে। ভেতরটা বড় দুর্বল। সব সময় ভয়ে ভয়ে তার দিন কাটে। সে চিন্তায় বিষণ্ন। বুকে পাষাণ চাপিয়ে মনে মনে ভাবতে থাকে এখন কী হবে? কি করে সে টিকে থাকবে? এখন সে একদম একেলা। পতিপরায়ন শিরিন মুমূর্ষু স্বামীর শয্যা পাশে কাতর দৃষ্টিতে অপলক ভাবে চুপ করে বসে থাকে। মৃত্যুর স্পষ্ট ছায়া মুখের উপর এসে গেছে। সে মনে মনে আল্লাহকে ডাকে আর বলে "হে আল্লাহ বিপদ থেকে রক্ষা করো।

এদিকে ধোঁয়াভর্তি অন্ধকারের ভেতর দিয়ে মতিনের দিন কাটে। শিরিনের দুর্দিনের কথা, তার দুঃখের কথা এবং তার কান্নার কথা মতিন সরকার আজও টের পায়নি। সে কেবল বিভ্রান্ত প্রেম উন্মাদনায় চূড়। মতিন সরকার শিরিনের শক ওয়েভ আঘাত আজও অনুভব করতে পারলো না।

বেশ কিছুদিন থেকে মতিনের ভেতরের সবকিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তার মনটা দশখন্ড হয়ে চোখকান বন্ধ হয়ে যায়। শুধু সে ভেবেই মরছে। মনের আলো ম্লান প্রায়। কোন কাজে মন লাগে না। শিরিনের ভালোবাসার অন্তরাল দেখে মতিন ক্রমে প্রতিশোধ নেওয়ার স্বভাবে উঠে দাঁড়ায়। ঠিক করলো শিরিনকে আর কোন রেয়াৎ নয়। এখন সে উল্টো দিকে হাঁটবে। মতিন মনের ক্ষোপ নিয়ে বললো, যা হবার হয়েছে, আর কখনও না।

www.pathagar.com

ছায়াছায়া সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। এমন সময় গেটে সন্ধ্যার আলোআঁধারে মতিন হঠাৎ অস্পষ্ট কাকে যেন দেখতে পায়। প্রথমে ঠাওর করতে না পেরে মতিন প্রশ্ন করে।

কে, কে ওখানে?

শিরিন উত্তর দেয়, আমি।

জানের জান শিরিনকে দেখে মতিন রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে বলতে থাকে ও তুমি? এতো দিন কোথায় ছিলে? কোথায় লুকিয়ে ছিলে? কেন এসেছ? চলে যাও বলছি। আর কখন আসবেনা এখানে, জানিয়ে দিলাম।

মতিন বরদাস্ত করতে পারলো না রূপসী শিরিনকে। অগ্নি মূর্তি হয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠলো, কি চাই তোমার?

চোরের মত নতমুখে শিরিন একেবারে চুপ। এখন পর্যন্ত মুখ দিয়ে একটা কথাও বার হলো না তার। নীরবে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে মতিনের সব কথা। শিরিনের প্রতি মতিনের ক্ষোপের অবধি ছিল না সেদিন। কিছুতেই তার রাগ নামেনা। ক্রোধের ওপর ক্রোধ নিয়ে মতিন দাঁড়িয়ে থাকে। ক্রোধ ঠাণ্ডা হয় না। তখন তার দুচোখে আগুন। আক্রোশ এবং ঘৃণা বেরিয়ে এলো মতিনের দুচোখ দিয়ে।

পাপাচারের নিষ্ঠুরতায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে শিরিন ভয়াল মূর্তি হয়ে মতিনের কাছে সব কিছুর বোঝাপাড়া নয় অবসান ঘটাতে এসেছে। সে কেবল মতিনের দিকে তাকিয়ে আছে। কষ্টে ভেতরটা তোলপাড় করছে। তার বড় বড় চোখ দুটো জলে ভাসছে আর মুখবুজে শাড়ীর আঁচল দিয়ে বারবার চোখ দুটো মুছছে। মতিন মাত্রা ছাড়া রাগে শিরিনকে বারবার যত আঘাত করে যাচ্ছে শিরিনও ততই চম্‌কিয়ে চম্‌কিয়ে উঠছে।

মতিন থামলো না, রাগে আবারও গলা উঁচিয়ে বলে উঠলো, টাকা? কতটাকা চাও? দশ হাজার, বিশ হাজার, বল কত চাও? কত টাকা হলে তুমি শান্তি পাবে? কত হলে তোমার টাকার নেশা কাটবে? এসেছ টাকার জন্যে কিন্তু কেন? সুস্থবুদ্ধি দিয়ে মন্দটা বুঝলে না? আবারও এসেছ অত্যাচার করতে। আমাকে বারবার যন্ত্রণা দিতে তোমার লজ্জা করে না? অর্থ লালসা তোমার এখনও মিটেনি? তোমার প্রতি আর করুণা নয়।

www.pathagar.com

মতিন রুক্ষ কণ্ঠে আবারও বলে উঠলো না না, আর কোন দয়া নয়। আর মুখ দেখিও না। আমার বুকের জ্বালা আর বাড়িও না। তুমি আমার প্রথম প্রেমকে করেছ অপমান, করেছ হত্যা। লাগামহীন ভাবে কথাগুলো বলতে থাকে মতিন সরকার। থামেনা সে তখন তার ভেতরটা আগ্নেয় গিরির মতো বিস্ফোরণ ঘটলো।

মতিন বুঝলো নারী চরিত্র নিজেদের খোলস পাল্টে এভাবেই পুরুষদের পাশে এসে বাঁচতে চায়। এটা তাদের স্বভাব।

পুরোনো প্রেমের দুঃখ ভুলে নতুন প্রেম সৃষ্টির সম্ভাবনা টুকুও মতিনের কাছে আর থাকলো না। মতিন তার প্রেমের যে বীজটি শিরিনের মনের ভেতরে পুঁতে দিয়ে ছিল তা আর অঙ্কুরিত হল না। শিরিন মতিনের কাছে ছিল কৃপণের ধন। সে নিতে শিখেছে, দিতে শেখেনি। মতিন এখন এটা বোঝে।

শিরিন নিরুত্তরে মতিনের কাছ থেকে ভৎসনার কথাগুলো শুনতে থাকে। অতঃপর সে বুকফাটা ফোঁপানি কান্নায় পাল্টা উত্তর দিতে মৃদুস্বরে বলে উঠলো, না, এ জীবনে আর কিছু চাই না। সে আবারও বললো, বলছি তো আর কোন কিছুর দরকার নেই।

মতিন তার মনটা পাষাণ করে শক্ত গলায় বারবার বলতে থাকে কেন চাওনা, কেন, কেন?

আর প্রয়োজন নেই। আমার জীবনের সব চাহিদা শেষ হয়ে গেছে।

মতিন ব্যঙ্গস্বরে বলে উঠলো নিশ্চয়ই থাকবে। রাজনন্দিনীর মত তোমার নারী মনের চাহিদা এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল? কথা থামায় না, কমায়ও না, ঝড় বইয়ে দিল মতিন সরকার। আজ সে ভালোবাসার প্রতিশোধ নেবে।

স্বামী মরে যাওয়ার মাস দুই পর শিরিন এসেছে মতিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে। এসেছে ভীত হয়ে আলাদা মন নিয়ে। বড় সংকোচে। এসেছে অনাহারে থাকা দুর্বল দেহটা নিয়ে। তার অনাহারের কথা এ পর্যন্ত কেউ জানে না। এখন তার ভেতরে দুঃখ আর অসহ্য জ্বালা।

রাস্তায় কর্পোরেশনের বাতিটা এতোক্ষণে জ্বলে উঠায় মতিন ক্ষুব্ধ

www.pathagar.com

মনে সিঁড়িগেটের পাশে শিরিনকে কাছে থেকে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে তার সারা শরীরটা কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। ভয়ে তার হাত পা কাঁপতে থাকে। মতিন দেখতে পায় শিরিনের পরনে একটা সাদা থানশাড়ী, হাতে চুরি নেই, সেই রূপ নেই, সেই শ্রীও নেই। অন্য দিনের মত তার কপালে সোনালী টিপের ফোঁটাও নেই। মাথা ভর্তি রুক্ষ কালো কেশরাশি এলোমেলো হয়ে ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে আছে। তার দু নয়নে শ্রাবণ ধারায় অঝোরে অশ্রু ঝড়ছে। মলিন চেহারায় ভিখিরী বেশে সিঁড়ির দেয়াল ঘেঁসে মুখটা নিচু করে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজ তার দেহে শোভা নেই, চোখমুখ ফ্যাকাশে, চেহারায় নাই যৌবনের বিপুলতা। ডানাভাঙ্গা পাখীর মতো তার দেহটা থরথর করে কাঁপছে। দেখে মনে হল এ যেন আর কেউ।

শিরিনের মুখের দিকে তাকিয়ে মতিনের মনে হলো তার যৌবন লাবণ্যের সুন্দর চেহারাটা কদিনের ব্যবধানে ষাট বছরে বুড়ি থুবড়ী হয়ে শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে। যৌবন আর সে দিনের বয়স আর নাই। যেন বহুদিন খেতে পায়নি। হয়তো আর বাঁচবে না। চেহারার নমুনায় তাই বুঝা যায়। মতিন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারে না। এই বেহাল দৃশ্য মতিনের মনের গতিকে স্তব্ধ করে ফেললো। চোখেমুখে আতঙ্ক। মুখ থেকে আর একটা কথাও আসে না মতিনের।

শিরিন আকুল হয়ে আবারও কেঁদে উঠলো।

মতিন তার দিকে ফিরে তাকালো। মুখখানি বড় করুণ দেখলো। এবার মতিনের চোখের কোণায় জল এলো।

শিরিনের মলিন অবস্থা দেখে মতিন কেমন যেন ভয় পায়। চোখ দুটো মুছে নিজেকে সামলে নেয়। মুখটা নিচু করে খুব শান্ত গলায় মতিন প্রশ্ন করে, শিরিন তোমায় বলতে হবে কেন তোমার এ সর্বনাশ?

এবার মতিনের মনে হৃদয় জেগে উঠলো। খুব শান্ত গলায় প্রশ্ন করে, শিরিন তোমার কি হয়েছে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মতিন গলাটা কিঞ্চিৎ সংযত করে করুণার সুরে আবারো জিজ্ঞেস করে, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? হঠাৎ তোমার এমন জীর্ণ বেশই বা কেন?

www.pathagar.com

শিরিন কাঁপাকাঁপা গলায় উত্তর দেয়, না, কিছু হয়নি আমার।

তবে এ বেশে কাঁদছো কেন?

শিরিন কিছুটা চুপ থেকে মতিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, তুমি নিজেকে আমার ভেতর অতো খানি ঢেলে দেবে তা ভাবিনি। ভাবিনি আমার সাথে অমন করে জড়িয়ে ফেলবে কিংবা আমাকে নিয়ে প্রেমের স্বপ্ন দেখবে। যা বলতে চাই শোন, আমি তোমাকে কখনও ভালোবাসিনি। যেটুকু দেখছো সবই ছিল ছলনার অভিনয়। আমার মতো এমন মেয়ে মানুষ আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর দুটো পাবে না। কারণ আমার স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য তোমার কাছে কি না করেছি। এ সবই ছিল আমার প্রবঞ্চনার অভিনয়।

সে আবারও বলতে থাকে, আমার মনের সত্যটা তোমাকে কোন দিন বলতে সাহস হয়নি। স্বার্থের লোভে তোমাকে চেয়েছি। তোমার কাছে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। বলতে বলতে শিরিনের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে থাকে। নাড়ী ছেঁড়া আর্তনাদে শিরিন এবার বলতে থাকে, আমি ক্ষত জীবন নিয়ে তোমার কাছে পাপগ্লানির মুক্তি চাই। তোমার কাছে নিজেকে ছদ্মবেশে লুকিয়ে রেখে কেবল প্রেমের ছলনা করেছি। অমোঘ ক্লান্তির চাপে আমার হৃদয়ের মর্মস্থল বড়ই দুর্বল। আমার জীবনটা অপরাধে ভরে আছে। এসেছি অপরাধের শাস্তি নিতে। আমাকে যা খুশি শাস্তি দাও। আজ আমার সব শেষ। কথাগুলো বলতে বলতে শিরিন কেঁদে কেঁদে আবারও বলতে থাকে, আমি ঠগ, আমি প্রতারক, তোমার সাথে প্রতারণা করে টাকা নিয়েছি কেবল আমার পীড়িত স্বামীর চিকিৎসার জন্যে। আমার জীবনের জন্য লড়াই শেষ। রুগ্ন স্বামীর সঙ্গে ঘর করেছি। প্রাণপণ স্বামীর সেবা করেছি। দেবচরিত্র স্বামীকে নিজের সবটুকু দিয়ে বাঁচানোর জন্যে অনেক চেষ্টা করেছি। মিথ্যা প্রেমের অভিনয় করে তোমার কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছি। তবুও প্রাণের স্বামীকে বাঁচাতে পারিনি। আর টাকা নিয়ে কী করব? যমদূত আমার ভালবাসার স্বামীকে আমার কাছ থেকে জন্মের মত ছিনিয়ে নিল। চোখের সামনে দেখলাম মৃত্যু গ্রাস দৃশ্য, দেখলাম ধ্বংসের নিষ্ঠুর আঘাত। মৃত্যুর যমদূত আমার সর্বনাশ বুঝলো না। মুহূর্তে জীবনের সব চুরমার করে

www.pathagar.com

দিলো। আজ আমি আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত এক অভাগী বিধবা নারী। আমার আপাদমস্তক দুর্ঘটনার আবর্তে ঢেকে গেছে। আমার চারপাশ অন্ধকার, অসহ্য যন্ত্রণা।

শিরিন তার চোখ দুটো শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে, বলল, তোমাকে কাহিনী শোনাতে আসিনি। এসেছি আমার পাপের শাস্তি নিতে। আমি পাপী। আমার পাপের শাস্তি দাও। পাপিষ্ঠাকে প্রহার কর, নির্মমভাবে প্রহার কর। আমাকে মেরে ফ্যালো। এবারে শিরিন মতিনের একেবারে সামনে এসে কথাগুলো বলতে বলতে পাঁচ দিন না খাওয়া উপবাসী শিরিনের দুর্বল দেহটা মতিনের পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

আলো আঁধার সন্ধ্যায় মতিন পাথরের মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে নিজের চোখের বিন্দু বিন্দু অশ্রু রুমাল দিয়ে মুছতে থাকে। মতিন তার অন্তরের ব্যাকুলতা নিয়ে আপন মনে বলতে থাকে, শিরিন তোমাকে ভালোবেসেছি তোমার রূপের জ্যোছনা দেখে। তোমাকে প্রথম দেখায় আমার চোখ ধন্য হয়েছে। তোমাকে এখনও ভালোবাসি। ভালোবাসি সত্যিকার প্রেমিকের মত। আজ থেকে তোমাকে ভুলবো। সহিষ্ণু হয়ে তোমাকে ভুলবো। ব্যর্থ প্রেমের আঘাত সইব। তোমার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না। খুব ইচ্ছে হলেও না। তুমি বিরহের শুকতারা হয়ে আমার মনের আকাশে চিরদিন জ্বলবে। তোমাকে দেখার তৃষ্ণা আর কোন দিন মিটবে না।

মতিন শিরিনের হৃদয় মাঝে নিজেকে স্থান করে নিতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তা আর হয়নি। তাকে নিয়ে সংসার সাজাতে পারেনি। শিরিনের মোহে মতিনের জীবনে ভালোবাসার সমাপ্তি ঘটলো। তাদের জীবনের সাধ কারো মিটেনি। কাতর হৃদয়ে মতিন তার অতৃপ্ত ভালোবাসার প্রায়শ্চিত্ত করলো। তারা ভুল করেছে, দোষ করেনি। ভুলের পঙ্কিলে দুজনেই নিমজ্জিত হলো। তাদের অন্তরের মায়াখেলা ভেঙ্গে গেল। যৌবন বসন্তের ফুল ঝরে গেল। হৃদয় বাঁশীর সুর নীরব হলো। শিরিনের নাটকের শেষ দৃশ্যটা ছিল বড়ই করুণ। ভাগ্যের খেলা যা ঘটার তাই ঘটলো।

দৈবক্রমে মতিনের ভালোবাসার অনুরাগ শিরিনের আর্তনাদের গভীরে হারিয়ে গেল। কোথায় কি হয়ে গেল। তাদের ক্ষুদ্র প্রাণের হৃদয়

www.pathagar.com

দুটো চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন হয়ে গেল। মানুষের জীবনে দুঃখের একটা সীমা আছে কিন্তু হলে কি হয়? শিরিনের কালহরণ দুঃখ যাবজ্জীবন যাতনা ভোগের দুঃখ। তাকে সান্ত্বনাটুকু দেবার কেউ থাকলো না। এতো বড় অ্যাক্সিডেন্টের যন্ত্রণা নিয়ে তাকে এই পৃথিবীতে বাঁচতে হবে।

নিষ্ঠুর পৃথিবীটাতে তাকে দেখার মত আর কেউ থাকলো না। তার দুঃখকাতর জীবনে সুখের ছোঁয়া কোন দিন মেলেনি। শৈশবে পিতামাতাহীন শিরিন, যৌবনে স্বামীহারা শিরিন, পরিশেষে নিঃসন্তান শিরিনের বাকী জীবনটাকে করে দিল দুর্ভাগ্যের অভিশাপে দুর্বিসহ। হায়রে ভাগ্যহীনা নারী! তার কাছে পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিভে অন্ধকার নেমে এলো। হতভাগীর কোন চুলোয় ঠাঁইগতি হবে অন্তর্যামী তার মিমাংসা করে দেবে।

প্রেমবঞ্চিত মতিনের জীবনে এনে দিল অপরাধ বোধের যন্ত্রণা। ব্যর্থ প্রেমের অপবাদ নিয়ে প্রেম দহনে পলেপলে দগ্ধ হতে থাকে মতিন সরকার।

www.pathagar.com

শেষ বদলি

ভোরবেলা। আঁধার এখনও কাটেনি। একটু পরে আলো ফুটবে। পূবদিকের মেঘগুলো রঙিন হয়ে এসেছে। সূর্য উঠতে কিছুটা দেরী থাকলেও পূবের আকাশ আস্তে আস্তে ফর্সা হয়ে আসছে। সময়টা তখন শীতের গোড়া। চমৎকার! বড় মধুর মনে হচ্ছে।

ফজরের নামাজ পড়ে ব্যালকনিতে একটা চেয়ারে বসে আয়েস করে চায়ে চুমুক দিচ্ছি। এ সময় চা খেতে খুব ভাল লাগে। প্রত্যেক দিন এমনি করে ব্যালকনিতে বসে বসে এক কাপ চা পান করি।

হঠাৎ কলিং বেলটা কিক্ কিক্ করে বেজে উঠলো। কিছুটা বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে বললাম, দেখতো এই অসময়ে কে আবার এলো। স্ত্রী ফিরে এসে বললো, উর্দিপড়া একটা পুলিশ অফিসার তোমার সাথে দেখা করতে চায়। কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। পুলিশ! আমি হতবাক হয়ে গেলাম। কী ব্যাপার! পুলিশ কেন? আমার ঝামেলাহীন জীবন। অসময় আবার পুলিশ!

আমি কি এসব চিন্তা করতে করতে উঠে গিয়ে ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই পুলিশ অফিসার সালাম দিয়ে বললেন, আপনি কী মিষ্টার এম. এ হোসেন?

মাথা নেড়ে বললাম হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

পুলিশ অফিসার বললেন, দেখুন আমি একটা ইনকোয়ারী করতে এসেছি। একটু মৃদু হেসে বললাম, বলুন কি জানতে চান?

ইতিমধ্যে কাজের বুয়া ট্রেতে চা, মিষ্টি এবং খানকয়েক বিস্কুট এনে চায়ের টেবিলে রেখে গেছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহেব বললেন, আমরা আপনার হেড অফিস থেকে একটা কাগজ পেয়েছি। আপনার সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে রিপোর্ট করতে হবে আপনার সার্ভিস কন্‌ফার্‌মেশনের জন্য।

তিনি আরও বললেন, আমি আপনার সম্পর্কে ইতিমধ্যে কিছু তথ্য জেনে নিয়েছি। তবুও অফিস ফরমালিটি হিসেবে আসতে হলো।

প্রশ্ন করলাম, আমার সম্পর্কে কোথায় কি জেনেছেন?

www.pathagar.com

উত্তরে তিনি বললেন, গোপনে আশেপাশে দুচার জন ভদ্র লোকের কাছ থেকে আপনার বস্তুনিষ্ঠ গুণাগুণের হাবেলী জেনে এসেছি। ইতিমধ্যে আপনার জীবন তথ্যও সংগ্রহ করে নিয়েছি। একটু মৃদু হেসে ইন্সপেক্টর সাহেব বললেন, ভাল লোকের প্রভাব সমাজেও বিস্তার লাভ করে। আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করবো না। আমরা পুলিশের লোক চোখকান বুজে অনেক কিছু বলতে পারি। আপনি নতুন এসেছেন, সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমাদের স্মরণ করেন।

মুখ খুলে তিনি এর বেশী আর কিছু বললেন না। মৃদু হেসে বললেন, আচ্ছা, এখন তা হলে উঠি, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। পুলিশ অফিসা বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর সাথে করমর্দন করে বিদায় দিলাম। এরপর অফিসে রওনা হওয়ার জন্য রোজকার মতো কাজে ব্যস্ত হলাম। ডেইলিসেভিং করে বাথরুমে গোলস সারলাম। টেবিলে খাবার রেডি। টেবিলে বসে পেটভরে খাওয়াটাও সেরে নিলাম। হাতে সময় কম। অফিসের বেলা হয়ে গেছে। দেয়াল ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে আটটা বেজে গেল। ব্যস্ত হয়ে বেডরুমে পোষাক পরে অফিসে যাওয়ার জন্য ব্যাগটা গুছিয়ে নিচ্ছি এমন সময় কাজের মেয়ে দুপুরের টিফিন বাক্সটা টেবিলের উপর রেখে চলে গেল। সবকিছু ঠিকমত গুছিয়ে নিয়ে স্ত্রীকে বলে রোজকার মত অফিসে রওনা হলাম।

এখানে আমি নতুন। অফিসের অনেক কিছু এখনও ঠিকমত গুছিয়ে আয়ত্ত্বে নিতে পারিনি। সপ্তাহ দুয়েক লাগবে গুছিয়ে নিতে।। চেষ্টা করছি এবং তাড়াতাড়িও করছি সবকিছুতে পুরো মনোযোগ দিতে। অনেক পুরোনো কাজও এলোমেলো হয়ে আছে। সিস্টেমে নিতে বিলম্ব হচ্ছে। আগের পেন্ডিং ফাইলও জামা হয়ে আছে বেশ কিছু।

শুকুর আমার অফিসের পিয়ন। অল্প বয়সের যুবক। বয়স ত্রিশবত্রিশ। অফিসে জয়েন করার পর থেকে তাকে বেশ বেয়ারা বেয়ারা মনে হয়েছে। আদব কায়দারও কিছুটা কমতি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কাজেকামে বেশ পটু। কিছুটা বুদ্ধিমানও বটে। তার একটাই দোষ অফিসে সময় মত আসে না। তার অফিসে আসা নটার ট্রেন কটায় ছাড়ে সময়ের মতো। শুধু তাই নয় অনেক কমপ্লেনও আছে ওর বিরুদ্ধে।

www.pathagar.com

অফিসের অনেকে তার প্রতি অসুন্তুষ্ট। ক'দিনের মধ্যেই কারণে অকারণে তার বিরুদ্ধে কিছুকিছু কথা আমার কানে আসতে শুরু হয়েছে। কেন জানিনা হঠাৎ করে একদিন অহেতুক রাগে তার ওপর আমার মনটা বিষিয়ে উঠলো।

পরের দিন একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে অফিসে ঢুকলাম। আরম্ভ হলো নিত্য দিনের ঝামেলা। নানা কাজের ঝামেলায় ডুবে আছি। যত সব পুরনো ঝামেলার ধকল পোহাতে হচ্ছে। কাজের প্রেরণা নিয়েই কাজ করছি। কাজের ঝামেলায় ডুবে থাকলে দুনিয়ার সবকিছু ভুলে যাই। শুকুরের কথাও মনে নেই। কলিং বেলটা টিপতে অন্য একটা পিয়ন কালাচাঁদ সামনে এসে দাঁড়ালে বললাম "এক কাপ চা দাও।" টেবিলে গরম চা এলে ঠোঁট ঠেকিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ অফিসের বাইরে থেকে হট্টগোলের একটা শব্দ কানে এলো। সঙ্গে সঙ্গে চেম্বার থেকে বেড়িয়ে এসে দেখি পিয়ন শুকুর আলী এবং আর একজন পিয়ন গফুর দুজনে বেপরোয়া হয়ে মারপিট করছে। ইতিমধ্যে অফিসের অনেক কর্মচারী হট্টগোল শুনে ওখানে ভীড় জমিয়ে ফেলেছে। ওদের মারপিট দেখে বিরক্তি বোধ করলাম। দাঁড়িয়ে আছি ভীড়ের এক পাশে।

গফুর আমাকে দেখে ছুটে এলো। কী সর্বনাশ, একি রক্ত! ওহ মাই গড! লক্ষ্য করলাম ওর নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত ঝড়ছে। তবে আঘাতটা অতো গুরুতর নয়। তার দুহাতে রক্ত, শরীরেও। গফুর কাছে এসে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'স্যার, শুকুর আমার নাকটা ভেঙ্গে দিয়েছে।'

কান্নায় জড়ানো ওর শেষের কথাগুলো তেমন বুঝতে পারলাম না। সে অস্বস্তিতে মুখফুটে আর কিছু বলতে পারলো না। অন্য একটা পিয়ন যা বলল, তাতে বুঝলাম, শুকুর প্রায় দেরী করে অফিসে আসে। আজও তাই। একারণে গফুর টিটকারি দিয়ে ঠাট্টার ছলে তাকে একটা কটুকথা বলায় প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে শুকুর দুম্ করে একটা ঘুষি মারে ওর নাকের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে নাকের ভেতর থেকে রক্ত ঝড়তে থাকে।

দাঁতের পাশ দিয়েও রক্ত বার হচ্ছে। তবুও ভাল, মারাত্মক কিছু নয়।

www.pathagar.com

অনেকে অসাড় চোখে গফুরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখলাম শুকুর একটু আড়ালে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একজনকে উদ্দেশ্য করে শান্ত গলায় বললাম, গফুরকে কাছাকাছি কোন ডিসপেনসারীতে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দাও। চিকিৎসা খরচের টাকাটা অফিস থেকে বিল করে নিয়ে নেবে।

এরপর অবাক চোখে শুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকি। ভেতরে ভেতরে বড় অস্বস্তি বোধ করলাম। চাপা রাগে মনটাও ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসলো। বেশ কড়া গলায় বললাম, ছিঃ ছিঃ শুকুর তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছ। পেয়েছ কি? দেরী করে অফিসে আসবে আবার মারপিট করবে। এসব চলবে না, মনে রেখো এটা অফিস। অমন কান্ড করা ঠিক হয়নি।

শুকুর চুপ থাকলো না। গলা বাজিয়ে বলে উঠলো, কেউ আমার জাতবংশ তুলে গালাগালি করে অশ্রাব্য কথা বললে ঘুষি মেড়ে তার নাক উড়িয়ে দেব। ঠিক আছে স্যার। আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। একথা বলে সে মাথাটা হেঁট করে হনহন করে অন্য দিকে চলে গেল। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপও করলো না।

আমি অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তার কথায় আমার মনে যেমন রাগ উঠলো তেমনি হাসিও পেল। তার কথাবার্তায় আমার মেজাজটা উত্তপ্ত হয়ে উঠায় ভেতরটা আরও শক্ত হয়ে গেল। মনে ক্রোধ এলো। তার গলাবাজি সহ্য হলো না। ভেতরে ভেতরে আরও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠলাম। ঠিক করলাম বেটাকে টাইট করতে হবে।

রুমে ফিরে এসে আমার জুনিয়ার অফিসার রফিক সাহেবকে ডেকে পাঠালাম। তিনি এই অফিসের একজন পুরোনো লোক। ছোট পোস্ট থেকে ভাল কাজের জন্য প্রমোশন পেয়ে পেয়ে আজ তিনি এ পর্যন্ত এসেছেন। ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে অভিজ্ঞতায় চুল পাকিয়েছেন। ধর্মের প্রতি যেমন পরেজগার তেমনি অফিসের কাজেকর্মেও আছে সুন্দর অভিজ্ঞতা। তার ব্যবহার বড়ই সুন্দর। সব সময় সকলের সাথে সন্তুষ্ট মনে কথা বলেন। আফিসের দৈনন্দিন কাজকর্ম শেষ না করে বাড়ী ফেরেন না।

রফিক সাহেব আমার রুমে আসতেই শুকুরের ব্যাপারে একটা কড়া নোট দিতে বললাম। আমার কথায় তিনি একটু ম্লান হেসে বললেন, এতে

www.pathagar.com

কী কোন কাজ হবে, স্যার?

রফিক সাহেবের কথায় একটু বিরক্ত হয়ে বললাম,

তার মানে?" আপনি কি বলতে চান? রফিক সাহেব বিনয় প্রকাশ করে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, না স্যার, বলছি তাকে জব্দ করা কিছুটা মুস্কিলের ব্যাপার।

"কেন? বলে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলাম।

রফিক সাহেব উত্তরে বললেন, স্যার, আগেও দু'তিন জন অফিসার তার বিরুদ্ধে প্রোসীডিং ড্র করে ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছুই হয়নি। আমি তাকে ভাল করেই জানি।

একটু গম্ভীর হয়ে বললাম, হুঁ, তাই! ঠিক আছে, ওর পারসোনাল ফাইলটা আমাকে দিন। কাকে কিভাবে টিপে ধরতে হয় তা আমার জানা আছে।

রফিক সাহেব বললেন, স্যার, ফাইলটা আপনার বাঁ দিকের র‍্যাকেই আছে। এরপর রফিক সাহেব শুকুরের মোটা ফাইলটা আমার সামনে রেখে দিল। কয়েকটা পাতা নাড়াচাড়া করে দেখলাম তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। এর আগে কয়েক জন অফিসার শুকুরের বিরুদ্ধে কড়া নোট পাঠিয়েছে হেড অফিসে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি, বড় জোর কয়েক দিন বিনা বেতনে রাখা হয়েছে। এরপর যা তাই।

বসে বসে চিন্তা করতে লাগলাম কিভাবে শুকুরকে শাস্তি দেওয়া যায়। হঠাৎ মনে পড়লো আমার পুরোনো কলিক প্রশাসনিক ম্যানেজার জনাব কামাল উদ্দিনকে। ঠিক করলাম তাঁকে বলে শুকুরকে হেড অফিসে বদলি করতে হবে। মনে ভরসা পেলাম। আমাদের হেড অফিস মতিঝিলে। এতে মনের চিন্তা কিছুটা দূর হলো। শুকুরকে জব্দ করার একটা পথ পেয়ে মনের নিষ্ঠুর আনন্দে মেতে উঠলাম।

শুকুরের বদলির চিঠি পাঠালাম হেড অফিসে। এক সপ্তাহের মধ্যে হেড অফিস থেকে আমার নোটের জবাব এলো। শুকুরের হেড অফিসে বদলির অর্ডার এসে গেল আমার হাতে। এক সপ্তাহের মধ্যে তাকে সেখানে রিপোর্ট করতে হবে। কিন্তু মুস্কিল হলো শুকুর বেশ কয়েক দিন ধরে অফিসে আসছে না। আজ আটদিন হয়ে গেল তবুও সে অফিসে

www.pathagar.com

আসছে না। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বিনা সংবাদে দশদিন পার হলে অফিসের নিয়মে চাকরি নট হয়ে যায়।

রফিক সাহেবকে ডেকে শুকুরের অফিসে না আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি কিছুই বলতে পারলেন না।

পাঁচটার পর অফিসের ছুটি হলে কর্মচারীরা একে একে সবাই চলে গেল। এরপর আমিও অস্থির মনে বাড়ী ফিরে এলাম। মনটা বেশ ভার হয়ে আছে। বাড়ী ফিরতেই আমার চিন্তিত মুখ দেখে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো,

-- "তোমার কি হয়েছে?"

-- বললাম, কিছু না।

-- স্ত্রী আবারও বলল, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটেছে।

একটু বিরক্ত হয়ে আবারও উত্তর দিলাম, বললাম তো কিছু না।

স্ত্রী এবারও বলে উঠলো, হ্যাঁ কিছু একটা হয়েছে, তুমি চেপে যাচ্ছো। অন্য দিনের মতো তোমাকে খোলামেলা দেখাচ্ছে না। তোমার মুখটা বেশ গম্ভির গম্ভির মনে হচ্ছে। তোমার মুখের ভাবখানা ভাল লাগছে না। ও গো, বলো না, তোমার কী হয়েছে?

স্ত্রীর কথায় তেমন কান না দিয়ে একটু পরে বাড়ী থেকে পায়ে পায়ে বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে সোজা কখন যে বংশাই নদীর ধারে এসে গেছি অতোটা খেয়াল করতে পারিনি। বাড়ী থেকে নদীটা মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। আমি কিছুটা চিন্তিত থাকলেও বিকেলটা তখন বেশ ভালই লাগছিল।

ছুটির দিনে প্রায় বিকেলে এখানে বেড়াতে আসি। আজকের আসাটা ইচ্ছায় নয় অনেকটা খেয়ালে। ছুটির দিনে নদীর ধারে বসে বসে যৌবনভরা নদী দেখতাম। দেখতাম নদীর বুকে পাননি নৌকার আনাগোনা। দেখতাম নদীর ঢেউ খেলানো স্রোত নৃত্য। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে কখনো একা একা তাকিয়ে থাকতাম দূরে, ঐ শূন্যে যেখানে অন্তিম সূর্যটা আকাশ থেকে নেমে এসে নদীর পানিকে আলিঙ্গন করে। আবার বসে বসে শুনতাম মাঝি মাল্লাদের কণ্ঠে ভাটিয়ালী গানের অপূর্ব উল্লাস।

অনেক সময় মনে মনে চিন্তা করতাম নদীর যৌবন আছে, জীবন আছে, আছে তার মৃত্যু। পদ্মানদীর দিকে তাকালে তার প্রমাণ মিলে।

www.pathagar.com

জীবন ধারায় নদী আমাদের এনে দেয় সুখদুঃখের পরিবর্তন। অর্থকড়ি জীবনে নদী আমাদের প্রাণ, খেয়ে পরে বেঁচে থাকার উৎস। ভাঙ্গাগড়া খেলায় এই নদীই আবার আমাদের সর্বনাশা।

পাশেই সাভার থানা। থানার পাশ দিয়ে নদীর কিনারা ঘেঁষে রাস্তাটা সোজা সাভার বাজারে ঢুকে এসেছে। সামনে কয়েক গজ দূরে আদু মুদির দোকান। দোকানটা বেশী বড়ও নয় আবার ছোটও নয়। দোকানে সব জিনিষই পাওয়া যায়। বিক্রির জন্য দোকানটা সাজানো আছে রকমারি জিনিষ দিয়ে। তেল-নুন, ঝাল-মশলা, চাল-ডাল, সাবান-সোডা, বিড়ি-সিগারেট, মুড়ি-চানাচুর, লজেন্স-চকলেট, সবই আছে। আদু মুদি কারো কাছে কোন জিনিষের দাম বেশী রাখে না। বিক্রিবাট্টা ভালই হয়। ধীরে ধীরে আদুর দোকানটা উন্নতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যে হলে পাড়ার জোয়ান, আধজোয়ান লোকেরা দোকানের সামনে পেতে রাখা একটা বেঞ্চে বসে বসে আড্ডা জমায়। আদু মুদি রসিকতা করে বেশ মজার মজার গল্প বলতে পারে। গল্পের ভেতর ভরা থাকে অনেক মালমশলা। ওরা তখন চনমনে হয়ে আদু ভায়ের গল্প শোনে। গল্পেগল্পে আসর মাতিয়ে ফেলে। রসের গল্প শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে হাঃ হোঃ হাঃ হাঃ করে সবাই হেসে ওঠে। আদু মুদির কাছে গল্প শুনতে বসলে কেউ উসখুস করে না, উঠে যেতেও পারে না।

মনে মনে ভাবলাম ভালই হলো। শুনেছি শুকুর নাকি এখানে আশেপাশে কোথায় যেন থাকে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কিছু দূরে এগিয়ে যেতে একটা মুদির দোকানের সামেন এসে দাঁড়ালাম। দোকানে বসে ছিল মধ্য বয়সী একটা লোক। সে আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে আহ্বান জানালো। প্রথমে আমাকে খন্দের ভেবেছিল। আমাকে সালাম দিয়ে একটা টুল এগিয়ে দেয়। আমি টুলটাতে বসে পড়লাম। লোকে বলে এটাই আদু মুদির দোকান। দোকানীকে শুকুরের কথা জিজ্ঞেস করতে সে বললো, ঐ সামনে চারপাশে টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা বাড়ীটাতে থাকতো কিন্তু তাকে তো আর পাবেন না। কথাটা শুনে বললাম পাবো না মানে?

দোকানদার উত্তর দেয় আজ আটদিন হল সে অ্যাকসিডেন্ট করে মরে গেছে। কী করুণ ভাবে প্রাণটা হারালো একটা ট্রাক ড্রাইভারের হাতে। মাতাল ড্রাইভার কোন দিকে ভ্রক্ষেপ না করে চোখের পলকে

www.pathagar.com

শুকুরের সব কিছু চুরমার করে দিল। শুকুরের ছিন্নভিন্ন দেহটা মাটির নীচে চাপা পরে গেল।

দোকানদারের কথাটা শুনে ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠলো। বুকের ভেতরে তোলপাড় শুরু হলো। কি আশ্চর্য! বড় বিস্ময় হলাম। মনে মনে চিন্তা করলাম এতোবড় দুর্ঘটনার খবরটা অফিসে কেউ জানল না। এরপরেও সাতআটটা দিন কেটে গেল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। তার দিকে চোখ মেলে তাকাতে সে আবারও বলে উঠলো, কদিন আগে থেকে পাড়ায় তাকে পাগল পাগল চেহারা দেখতাম। জানতে চাইলে সে কিছুই বলতো না। সন্ধ্যা হলে মাথায় উসকো খুসকো চুল নিয়ে মনের হাহুতাশে নদীপারে বসে থাকতো অনেক রাত অবদি। মাঝে মাঝে রাস্তা চলতো কেমন যেন নেশাখোর লোকের মতো টলতে টলতে। আহা! বেচারীর কি যে হলো! মাঝে মাঝে দেখতাম শুকুর খালি পায়ে গুণগুণ করে গান করতে করতে দোকানের সামনে দিয়ে চলে যেত। গলা ঝেড়ে ডাকলে সারা দিত না। আদু মুদি আবারও বলতে থাকে, এই তো সেদিন রিক্সাওয়ালা না ধরলে রিক্সা থেকে নামতে যেয়ে হুমড়ী খেয়ে বেচারী পড়ে যেত। তাকে অনেক দিন থেকে হাসিখুসি দেখিনি। সারাক্ষণ চিন্তা চিন্তা ভাব।

ছোটবেলা মাবাবা মরে গেলে শুকুর অনাথ এতিম হয়ে দারিদ্র্যের রসাতলে ডুবে যায়। তার ফুফুই তাকে মায়ের মত কোলে কাঁকে করে বড় করে তোলে। তার বিয়েথা দিয়ে ঘরসংসারী করে দেয়। ওদের দাম্পত্য জীবনটাও ছিল বেশ আনন্দের। ওর বউটাও অনেক সাদাসিধা স্বভাবের। বড় শান্ত। পাড়ায় কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ করতে দেখিনি কোন দিন।

আদু মুদি আবারও বলতে থাকে, কথায় কথায় শুকুর বড় আশা নিয়ে বলতো, জীবনে তার একটাই সখ, ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখাবে, মানুষ করবে। বাপদাদার মতো তাকে কষ্ট করতে দেবেনা। সে যেন খারাপের পথে না যায়, বংশের মুখে চুনকালি না দেয়।

"মরার দুদিন আগেও সে আমার দোকানে বসে বিড়িতে টান দিতে দিতে বলতে থাকে "জানিস আদুভাই আমার ফুফুর মত ফুফু কজনে পায়। ফুফু ছোটবেলা থেকে মায়ের মত স্নেহযত্ন দিয়ে আমাকে মানুষ করেছে। মায়ের যত ভালবাসা ফুফুর কাছে সবই পেয়েছি। কোনটার

www.pathagar.com

ঘাটতি ছিল না। ফুফু জানতো আমি কি খেতে ভালবাসি। নারকেলের নাড়ু, চালের আটার নানারকম পিঠা বানাতো সাথে আরও কত কী। সুঁইসুতো দিয়ে কাঁথায় নকশা করা, রুমালে ফুল তোলা, চাটাই বোনা, সুন্দর করে ঘর নিকানো ফুফু সবই করতো।

ছোটবেলা ফুফুর কাছে রাতের বেলা শুয়ে শুয়ে কত গল্প শুনতাম। ভূতেরগল্প, পরীরগল্প, পীরফকিরের গল্প আরও কত মজার মজার কেচ্ছা শুনাতো আমাকে। কোন গল্প বাদ দিতো না। শেষটা শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে যেতাম। ফুফু জোহরের নামাজ পড়ে কী মিষ্টি সুরে কোরআন পড়তো। ও পাড়ার নাসিমা চাচি এসে নীরবে ফুফুর কোরআন পড়া শুনতো।

ফুফু বুড়ী হয়ে কুজো হয়েছে, আশিতে পা দিয়েছে। কানে শোনে কম। মুখে দাঁত নেই একটাও। দেহের চামড়া কুঁচিয়ে গেছে। চোখে ছানি পড়ে অন্ধ হয়েছে। ছানিটা কাটিয়ে নিতে পারলাম না। টাকা পাবো কোথায়? গরীবের সংসার। ছা-পোষা মানুষ। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। সব সময় মাথাভর্তি ভাবনা নিয়ে বেঁচে আছি। ফুফুর খাওয়া পরা থেকে শুরু করে ওষুধ পথ্য সবই টানতে হয়। অভাব অনটনের কষ্ট আমাকে হতাশ করে রেখেছে। পায়ের নিচে মাটি সরে গেলে মানুষ বাঁচে কেমন করে? এতো কষ্ট আর সহ্য হয় না। জীবনে ভাল করে দুটো পয়সার মুখ দেখলাম না, সুখের নাগালও পেলাম না। সংসারের কষ্টটা আমাকে ঘামিয়ে রেখেছে। আমি চোখ বুজলে ওদের কী হবে? বউটা না হয় লোকের বাড়ী ঝিগিরি করে খাবে। ছেলেটারও একটা গতি হয়ে যাবে। কিন্তু আমার ফুফুর কী হবে? ফুফুর শেষকালে আমি ছাড়া তার আর কে আছে? আমিই তো ফুফুর বুড়াকালে হাতের লাঠি।

আদু দোকানী আবারও বলতে থাকে, শুকুর পাড়ায় কারো সাথে তেমন মিশতো না। তার কোন বন্ধুবান্ধবও ছিল না। আস্তে আস্তে সব চুকেবুকে গেছে অনেক আগে। শুকুর মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে হাঁপ ছেড়ে দুটো সুখ দুঃখের কথা কইতো। একদিন আক্ষেপ করে বললো, "আদু ভাই চাকরিটা হয়তো আর থাকছে না। চাকরি গেলে খাবো কি?

আবার কে চাকরি দেবে? এসব চিন্তা করলে মাথাটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

বললাম, তুই পাগল না কী? এসব কথা ভাবছিস কেন?

বললো, আদু ভাই কথাটা আলগা ভাবে ধরো না। সকালে বাজারে মাছ বিক্রি করে দুপয়সা বাড়তি আয় রোজগার করে অফিসে যেতে একটু দেরী হয়। তাও সব দিন না। এতে আমার উপর অনেকের চোখ পড়ে। তাদের কাছে ঈর্ষার কারণ হয়েছি। চাকরির টাকা আর মাছ বেচার সামান্য কিছু বাড়তি আয় রোজগার করে সংসারটা জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছি। অনেকে তা সহ্য করতে পারে না। তারা এটা ভালচোখেও দেখেনা। আজকাল অফিসে দেরী করে কে না আসে? ভোগের আনন্দে আমার কোন ঝোঁকও নেই লোভও নেই। নিন্দুক জীবন কোনদিন কামনা করিনি। সুখের অভাবে জীবনটা মরুভূমি হয়ে আছে। ভেতরটা সব সময় খাখা করে। জানিনা এর শেষ কোথায়?

মৃত্যুর পর নরকের চিন্তাও আমাকে ভয় দেখায়! ওরা আমার পেছনে লেগে থেকে যা করে করুক। আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে চায় তাও করুক। কেন রে বাপু! আমাকে নিয়ে এতো হৈ চৈ। কপালে যখন সুখ জুটলো না তখন ওদের এসব কথার ওপর ঘেন্না করে পেট ফুলাবার কি আছে! আমার কষ্ট দেখে ওরা যদি হাততালি দিয়ে আনন্দ পায়, পাক। আদু মুদি এর বেশী কিছু বলে না।

শুকুর তার ছেলেটাকে স্নেহের আবেগে বড়ই ভালবাসতো। সন্ধ্যা রাতে শুকুর মাঝে মাঝে তার বছর চারেকের রোগাপটকা ছেলেটাকে দু একটা চকলেট কিনতে আসতো আদুমুদির দোকান থেকে। আদু মুদি দাম না নিলে শুকুর ক্ষেপে উঠতো। সেকেন্ডের মধ্যে ঠোঁটের কোণায় কোমল হাসি দিয়ে বলতো "আদুভাই কাজটা ভালো হচ্ছে না, দাম না নিলে ঝগড়া করবো। দুটো পয়সার জন্যেই তো তুমি এখানে বসে আছো। শুকুর দাম দিলে আদু আর কিছু বলে না।

শুকুরের সংসার জীবনে লুকিয়ে থাকা যতো দুঃখকষ্ট, হাসিকান্না তার মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে গেল। 'কথাগুলো বলতে বলতে আদু মুদি আমার দিকে একবার তাকিয়ে চোখের পানি সংবরণ করে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ হয়ে গেল। মনে হলো গলায় কান্না তার। শুকুর সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু জানলাম না। কেন জানি না।

www.pathagar.com

আমি অবচেতন মনে কি যেন ভাবতে ভাবতে নিজেকে একজন অফিসার মনে হওয়ায় চোখ দুটো বন্ধ করে একটা গভীর শ্বাস ছেড়ে নিজেকে সামলে নিলাম।

এরপর মনের অনুশোচনা নিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে বাড়ী ফিরলাম। মনের কষ্টে রাতের আহার পেটে না দিয়ে একগ্লাস ঠান্ডা পানি পান করে ঘরের বাতিটা নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি মৃত্যু জিনিষটা না থাকলে বেঁচে থাকার গৌরব সূচনা হয় না। এভাবে হৃদয় আঘাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছি। চোখে ঘুম এলো না। প্রবল যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। চিন্তা করতে থাকি তবে কি শুকুর অভিমান করে ভবসংসার থেকে বদলি নিয়ে চলে গেল অন্তহীন হেড অফিসে। মনের কাতর অবস্থা নিয়ে নিজেকে অপরাধী মনে করতে থাকি। ব্যাকুল আত্মা আমার ভেতরটা কুড়ে কুড়ে খেতে থাকে সারাটা রাত।

মধ্য রজনী পাড় হয়ে গেছে। অস্বস্তিতে বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে মনে হতে লাগলো কেন শুকুরের বদলির অর্ডার আনলাম। এটাই তার জীবনের শেষ বদলি তা কি ভেবেছিলাম? আবারও মনে হতে লাগলো এই মহাশক্তির লীলাখেলায় মৃত্যু হচ্ছে একস্থান থেকে আর এক স্থানে বদলির একমাত্র পথ।

জীবনে সবকিছু শেষ হলেও শুকুর আমার মনের মাঝে বেঁচে থাকবে পৌঢ় জীবনভাটা স্রোতের টানে। বেঁচে থাকবে আমার প্রবীণ কান্নার মাঝে, বেঁচে থাকবে বাংলার আকাশে বাতাসে, পাখির ডাকে, চিরন্তন সকল ক্ষেত্রে। এতোসব ভাবতে ভাবতে রাতের আঁধারে আমার দেহটা কম্পমান শিহরণে ছমছম করতে থাকে। মনে হলো ঘাড়ের পেছনটা কে যেন ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

ঘরের ভেতরটা অন্ধাকার। হঠাৎই বন্ধ দরজার ভেতর থেকে কানে একটা চীৎকারের আওয়াজ এলো। এরপর একটা করুণ আর্তনাদ। মুহূর্তে সব নীরব হয়ে গেল। আবার নতুন করে আরম্ভ হলো বাড়ীর ছাদের ওপর খালি টিনের ঝনঝনানো শব্দ। বেশ কয়েক বার শব্দটা হলো। এরপর থেমে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার ইট পড়ার দুমদাম শব্দ। মনে হলো ইটগুলো আছড়ে আছড়ে পড়ছে ছাদের ওপর। এটাও থেমে গেল। এমন শব্দ এর আগে কোনদিন হয়নি। সবকিছু দ্রুতগতিতে ঘটে

www.pathagar.com

গেল। তখন রাত গভীর। আমি ভয় পেয়ে চোখ খুলতে পারিনি। স্ত্রী বিছানায় ঘুমে ডুবে আছে। তাকে আর জাগালাম না। ঘরের ভেতরে থমথমে অন্ধকার। ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ পর দু'চোখের পাতা ভারী হয়ে ঘুমঘুম তন্দ্রায় চোখদুটো বুজে এলে মনে হলো ঘরের চার পাশের মেঝেতে শুকুর অদ্ভুত আকৃতিতে পা ফেলে ফেলে বলে বেড়াচ্ছে, "ঠিক আছে স্যার, আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। তাই করুন, বলতে বলতে মিলিয়ে গেল শুকুরের অশরীরী ছায়া।

আমি ভীত শঙ্কিত হয়ে রুদ্রকণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠলাম, "না না, শুকুর না। আমাকে ক্ষমা করো। আমি অপরাধী, তুমি নও, শুকুর তুমি নও।"

স্ত্রী ভয় পেয়ে হকচকিয়ে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে আমাকে জাগিয়ে বলে উঠলো, ও গো, কি হলো তোমার? এমন করছো কেন?

আমি কম্পমান দেহটা নিয়ে ধরমর করে বিছানা থেকে উঠে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "না কিছু না। একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি তাই।" তখনও আমার ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। সমস্ত শরীর ঘেমে গেছে। ভয়ে ঠোঁট কাঁপছে। কপাল থেকে বিন্দুবিন্দু ঘাম ঝড়ছে। দেহের ভেতরে বইছে রক্ত স্রোত। আর বুকের ভেতরটা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

www.pathagar.com

শৈশবের স্মৃতিকথা

আমি আমার কথা বলছি। বলছি সেদিনের কথা। যখন আমি ছোট্ট ছিলাম। ছিলাম শিশু কিশোর। ছেলেবেলা থেকে বছর পেরিয়ে পেরিয়ে ভাটার টানে আজ আমি প্রবীণ। শৈশব আর প্রবীণ এ দুয়ের মাঝে কত যে দূরত্ব এ নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামাইনি। কই না তো! তবুও মনে হয় এ যেন বসন্তের স্পন্দনে ভরা কত কাছের এ এক আত্মজীবন। মানুষের জীবনটা কত অদ্ভুত, কত বিচিত্র। সত্তর পার হয়ে আশি ছুঁইছুঁই। অবাক লাগে কেমন করে জীবন এতোগুলো বছর খরচ হয়ে গেল। জীবন যে নদীর স্রোতের মত প্রবাহমান শৈশবে তা কি কখনও ভেবে দেখেছি? বাতাস যেমন বয়ে যায়, স্রোতও তেমনি বয়ে চলে তার শেষ ঠিকানায়। এই চলার পথে ঘটে যায় কত ঘটনা, সুখের ঘটনা, দুঃখের ঘটনা, আনন্দের ঘটনা আরও কত রং লাগানো, রং বদলানো গপ্প কেচ্ছা শোনার মত কত কাহিনী।

আজকে যে শিশু আগামীতে সে আর শিশু থাকে না। এরপর আসে নবীন। বসন্তের মত ভরাযৌবন। তারপর হয়ে ওঠে মোহমুগ্ধ ভরা যৌবনের যুবক। টগবগে তারুণ্যের জীবনালেক্ষ্যে মিশে থাকে তার অতীতের শৈশব স্মৃতি। তখন তার সুখের প্রাণে ভেসে ওঠে কুসুম মঞ্জরীর মত নয়নাভিরাম দৃশ্য। এটা আগে বুঝলেও মনের গভীরে অতটা স্থান দিইনি।

একদিন ইসলামী ফাউন্ডেশেরনর উপ-পরিচালক সাহেবের অফিসে তাঁর সাথে আমার কথা হচ্ছিল, কোন একটা বিষয় নিয়ে। কথার মাঝে নেহাত ঘরোয়া আলাপের রেশ টেনে বললাম, আমার বড় ছেলের পরপর দুই কন্যা। তার কোন ছেলে সন্তান নেই। উত্তরে তিনি বললেন; ছেলের জন্য দুঃখ কেন?

বললাম, বংশ রক্ষার জন্য ছেলের দরকার। ছেলেই হচ্ছে বংশের রক্ষা কবজ। আমার সন্তানেরও ছেলের জন্যে একই আক্ষেপ। ছেলেপুলে না থাকলে কিসের সংসার?

www.pathagar.com

কথার ফাঁকে এবারও তিনি বললেন, আপনার ছেলে তো উচ্চ শিক্ষিত এবং যোগ্য মাপের একজন বড় ব্যক্তিত্ব। ভাল কিছু লেখার জন্যে আপনার ছেলেকে লিখতে বলুন। যুগেযুগে এই মাটির পৃথিবীতে জ্ঞান সাধক লেখকেরা কলম ধরে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। একজন ভাল লেখক জাতির কাছে যদি কোন ভাল গ্রন্থ উপহার দিতে পারে তখন ঐ জ্ঞানলব্ধ গ্রন্থই পিতার সন্তান অপেক্ষা হয় অধিক পুণ্য বস্তু। পাঠক যতকাল তাঁর গ্রন্থটি পড়ে জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাবে লেখক সারাটা জীবন সেখান থেকে বেহেশতী পুণ্যের অধিকারী হতে পারবে যা সদকায়ে যারিয়ার সওয়াব হিসেবে হাশরের ময়দানে তার উপকারে আসবে। পিতার রেখে যাওয়া সন্তান যদি সৎকর্ম পরায়ন না হয় তবে ঐ সন্তান পিতার জন্যে কল্যাণকামী হতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান সমৃদ্ধ পুস্তকটি লেখক পিতার সুসন্তান হিসেবে বিবেচতি হতে পারে। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন "আপনিও তো কিছু লিখতে পারেন। উত্তরে বললাম "কি বিষয় নিয়ে লিখব বলুন?" নিজের শৈশব স্মৃতি দিয়েই আরম্ভ করুন", তিনি বললেন।

মনে মনে ভাবলাম, ঠিকই তো। দেখিনা একবার চেষ্টা করে আমার সেই বন্ধনহীন শৈশব স্মৃতিকথার কাহিনীকে কেমন করে ভাষায় চিত্রায়িত করতে পারি। ছেলেবেলার ট্রাজেডির আবেগ থেকে আমার শৈশব স্মৃতির একটা ঘটনাকে লেখার জন্যে খুঁজে নিলাম। ঘটনাটা অনেক দিনের পুরানো। শৈশবের চিন্তার উপর ভরসা করে লেখার জন্যে লেখনি ধরলাম। নিশ্চুপ হলে চলবে না। আমার মনের চেতনা দিয়ে নিজের ভেতর নিজেকে জাগিয়ে তুললাম। অতঃপর নিজের আত্মবিশ্বাসের উপর ভরসা করে এগুতে লাগলাম। চিন্তা করলাম মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে কাজে লাগাতে পারলে ভালমন্দ যাই হোক আমি আমার মত লিখতে পারবো। আমি এই না যে আমার লেখা সবার কাছে পছন্দ হবে। তবুও আমার সোনালী শৈশবের কিছু উদ্দীপ্ত ঘটনা নিয়ে লিখব বলে মন ঠিক করলাম। নিজের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করে লেখার জন্যে সাহস

www.pathagar.com

পেলাম।

অতঃপর লিখব বলে লেখার ঝোক মাথায় চেপে বসলো। আমার ছেলেবেলাকে ভাষা নক্‌শায় অঙ্কন করে প্রবীণ থেকে অতীতে ফেলে আসা শৈশবের স্বপ্নময় দিনগুলো হোক না ক্ষণিকের স্মৃতিময় ভালোবাসা। ভালোবাসায় আছে স্বর্গীয় অনুভূতি। এজন্যে একটা শিশুর মূল আচরণ ফুটে ওঠে তার ভালোবাসার আবেগে। শিশুর মুখে কথাফুটার আগে সে ভালোবাসার মন নিয়ে চোখমেলে তাকায় তার মায়ের মুখের দিকে। তখন সে তাকিয়ে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে ভালোবাসার মিলন ঘটায়। শিশু তার ভালোবাসা দিয়ে মায়ের ভালোবাসাকে জয় করে। মাও তার ভালোবাসা দিয়ে সন্তানকে কাছে টানে। এর কারণ হচ্ছে তাদের মধ্যে দুজন দুজনে আকুলি বিকুলির টানে স্নেহ ভালোবাসা প্রকাশ করতে চায়। তখন তাদের ভালোবাসার ঝোঁক স্নেহের টানে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সন্তানের সুখের জন্য একমাত্র মা-ই সব কষ্টকে মাথা পেতে নিয়ে তাকে বড় করে তোলে। তার স্নেহ ভালোবাসার ছায়াতলে। এ কারণে শিশুর ভালোবাসায় নেই কোন ভন্ডামী। নেই কোন বিরুদ্ধাচরণ, কিংবা কোন নিন্দাবাদ। শিশুর ভালোবাসায় থাকে সোনালী উষার মত নির্মল হাস্যজ্যোতি, থাকে মায়াভরা উচ্ছ্বলতার আনন্দ। এ কারণে মমতায় ভরা ভালোবাসার আবেগে শিশুর শৈশব মন থাকে নির্মল, সহজ সরল। তার ভালোবাসায় জড়িয়ে থাকে শান্ত শীতল হৃদয়।

আমার ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি দুঃখ ক্লান্তির ভারে লুকিয়ে আছে আমার হৃদয় গর্ভে। শৈশবের ছোট বড় অনেক ঘটনা প্রবাহের স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমার ক্ষণিকের জীবন জুড়ে। চিন্তার জগতে এগুলো সব সময় আমাকে কাঁপিয়ে রেখেছে। ঘটে যাওয়া কত ঘটনা মস্তিকের স্মৃতি ভাণ্ডারে চাপা পড়ে আছে। এগুলো বের করতে মাথা ঘামাতে হয়। আবার চিন্তাও লাগে। মনের উপরেও চাপ ফেলে। অনেকগুলো স্মৃতির মধ্য থেকে বেছে নিলাম একটা অতীব দুঃখের ঘটনাকে।

লেখার জন্য লিখব বলে শৈশবের দিকে দৃষ্টি দিলাম। ফিরে এলাম ছেলেবেলার সেই দিনে যখন যেখানে যা ঘটেছে। মানুষের মগজের প্রধান

www.pathagar.com

উৎস শক্তি হচ্ছে স্মৃতিশক্তি। শৈশবস্মৃতির ভাবকল্পনা নির্ভর করে আমার ছোটবেলার স্মৃতিশক্তির উপর। স্মৃতিশক্তির আলোচনায় না এসে শুরু করছি আমার শৈশব জীবনের পল্লীস্মৃতি দিয়ে। মনে আছে আমার ছেলে বেলার অনেক স্মৃতিকথা। ছোট বড় অনেক ঘটনা প্রবাহের স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমার জীবন জুড়ে। আমার জীবনে এমন কিছু ঘটনা আছে যা জমাখরচের খাতায় আমাকে বিচলিত করে রেখেছে। ভাবতে গেলে চোখে পানি আসে।

আমার গ্রামের নাম হরিণডাঙ্গা। এক নিভৃত ছোট্ট গাঁ। এখানে আমার জন্ম। গাছগাছালির সবুজে ঢাকা। মাত্র কয়েক ঘর লোকের বাস। জাতিতে সবাই মুসলমান। মর্যদার দিক থেকে গ্রামটি দু'টো পাড়ায় ভাগ হয়েছে। এক পাড়ায় সম্ভ্রান্ত লোকের বাস। খান্দানী পরিবারে প্রভাব প্রতিপত্তি থাকলেও সে যুগে শৈক্ষিক জীবনে শিক্ষা গতির বিকাশ ধারায় গ্রামে কলম পেশার পরিবার ছিল না একজনও। গ্রামের আর এক পাড়ায় বাস করতো অনুগৃহীত গোষ্ঠী। চাষাভূষা কৃষক শ্রেণীর দিনমজুর মানুষ। তাদের বৈষয়িক জীবনের উন্নতি ছিল সুদূর প্রসারী এবং প্রচ্ছন্ন বেষ্ঠিত। তাদের বাঁচার জন্যে স্বপ্নসাধনা ছিল বিধাতার আশীর্বাদ। সামাজিক এবং আর্থিক কল্যাণে তাদের দিনমজুর পরিশ্রম ছিল চাষীকালচার পরিচয়।

গ্রামের বাইরে উত্তরপূর্ব দিকে কয়েক ঘর হাড়িমুচির বাস। গোত্রে নমশূদ্র। নীচু জাতের হিন্দু। নিজস্ব জমি জায়গা বলতে কিছুই নেই। তারা সব সময় হতদরিদ্র। গায়েগতরে পরিশ্রম করা আয় রোজগারে তাদের সংসার চলে। মুচি পাড়ার মতন মুচি ছিল পাড়ার দলপতি। সে তার পাড়ার ছেলেদের নিয়ে ডাগরকাড়া নামে একটি বাদ্যদল গঠন করে হিন্দু পূজাপার্বণে ঢুলি হিসেবে ঢোল বাজাতো। তখনকার দিনে হিন্দুসমাজে পূজামন্ডপ স্থলে ঢাক ঢোলের বাজনোর প্রচলন ছিল এবং এ প্রচলন আজও চালু আছে। ঢাকের বাজনা ছাড়া হিন্দুপূজা হয় না।

গ্রামের পশ্চিম দিকে মহিষডাঙ্গা একটি বর্ধিষ্ণু এবং বিত্তশালী হিন্দু ভদ্রলোকদের গ্রাম। প্রতিবছর এই গ্রামে দুর্গাপূজা পালিত হয়ে থাকে। দুলাল বাবু ছিলেন এই মহিষডাঙ্গা গ্রামের অভিজাত বংশের জমিদার।

www.pathagar.com

মস্ত বড় দালান বাড়ী। পুরোনো সেকেলে হয়ে আছে। তবুও দেখলে মনে হয় যেন রাজবাড়ী দেখছি। জমিদার বাড়ীতে আছে অন্দর মহল, সদর মহল, কাছারী বাড়ী। বাড়ীর প্রবেশ পথের অদূরে আছে পূজোর দালান বাড়ী। ভক্তদের জন্য পূজো মণ্ডপের সামনের উন্মুক্ত চাতালটা বেশ সুপরিসর। প্রতিবছর জমিদার বাবুর পূজার দালান বাড়িতে দুর্গাপূজা পালিত হয় অনেক জাঁকজমকের সাথে। পুজোর দিনগুলোতে আশেপাশের হিন্দুগ্রাম থেকে ভক্ত নারী পুরুষ, তরুণ তরুণী, কিশোর কিশোরীরা রং-চঙে নতুন নতুন জামাকাপড় পরে সেজেগুজে আসতো দুর্গা দেবীকে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনে প্রণাম করতে। শাস্ত্রপাঠ, ধর্ম আরাধনা এবং আরতি শেষে দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ফিরতো কেউ সন্ধ্যা রাতে, কেউ কেউ অনেক রাতে। ছোটছোট ছেলেমেয়েরা বাবার হাত ধরে, শিশুরা মায়ের কোলে চড়ে আসতো ঠাকুর দেখতে।

অষ্টমীর দিনে পূজোতলাটা অনেক জমে উঠতো এবং সন্ধ্যা থেকে রাত্রি পর্যন্ত ভক্তদের ভীড়ভাট্টা হতো বেশী। দু'চারজন ছোকড়া বয়সের যুবকেরা বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে পূজো তলায় ঘোরাঘুরি করে সময় কাটাতো। তাদের তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরার কোন তাড়াহুড়া থাকতো না। তবে তাদের সবাই নয়, অনেকে আসতো যুবতীর যৌবনের কাছে চোখের ভালবাসা বিনিময় করতে, দেবীর দেবীত্ব নিয়ে নয়।

মতন মুচি ছিল দুর্গা পূজার ঢুলী। প্রতিবছর ঢাকঢোল বাজিয়ে একটা মোটা অঙ্কের টাকা পেত জমিদার বাবুর কাছ থেকে। এতে তার মনে উৎসাহ আরও বেরে উঠতো দলকে সুন্দর করার কাজে। পূজোর দিনে মতন মুচি একবার ঘরে তৈরী চোলাই মদের নেশায় চুর হয়ে ঢাক বাজানোর সময় বেশী বেশী মাতলামী করায় মারপিট করে প্রতিপক্ষের আক্রমণে মারাত্মক আহত হয়ে শেষ পর্যন্ত সে মরেই গেল। এরপর বিভিন্ন কারণে তার দলের ভাঙ্গন ধরলে দলটি আর টিকে থাকলো না। মতন মুচির মৃত্যুর পর মুচি পাড়ায় ঢাক ঢোলের পিঠে আর কোন দিন কাঠির বাড়ি পড়েনি।

গ্রামের আর একদিকে রয়েছে একটা সাঁওতাল পাড়া। সাঁওতাল জাতি দ্রাবির মানব গোষ্ঠির একটা আদি জাতি। কালের প্রবাহে কখন

www.pathagar.com

থেকে এরা গ্রামের মাটিতে চরণ চিহ্ন রেখে বসবাস করছে তা আমার জানা নেই। এরা বহুকাল থেকে গ্রামের বাইরে মহল্লা গড়ে দলবদ্ধ হয়ে সবাইকে আপন করে মিলেমিশে বাস করছে। এরা খুব শান্তি প্রিয় জাতি, ঝগড়া বিবাদ মোটেই পচ্ছন্দ করে না।

কৃষিকাজ সাঁওতাল জাতির প্রধান জীবিকা। অন্যের জমিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে জীবন জীবিকা চালায়। তারা মনিবের কাজে খাটে বেশী। কাজের সময় কথা বলে কম। কাজে ফাঁকি কদাচিৎ দেয়না। স্বভাবে সাঁওতাল জাতি খুব সৎ এবং বিশ্বাসী।

তাদের নিজস্ব ভাষা এবং কৃষ্টি সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। লেখাপড়ার জন্য সাঁওতালী ভাষায় কোন বর্ণমালা আবিষ্কৃত না হওয়ায় আজ পর্যন্ত এই ভাষায় কোন বইপুস্তক রচিত হয়নি। এদের নিজস্ব ভাষাকে বলা হয় সাঁওতালী ভাষা। শুনতে বড় মিষ্টি। এটা তাদের মৌখিক ভাষা মাত্র। ইদানিং সময়ে তাদের মধ্যে অনেকে বাংলা ভাষায় পড়াশুনা করে নিজেদের আলোকিত করছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে হেনকালে তারা তাদের আদিসমাজ পারিপার্শ্বিকতা থেকে বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে নিম্নবর্ণ হিন্দু বাঙ্গালী সমাজে মিশে যাচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে এভাবে চলতে থাকলে একদিন তাদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি চিরতরে কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে এবং তাদের জাতীয় অস্তিত্ব হিন্দুত্বে মিশে বিলীন হয়ে যাবে।

সাঁওতাল জাতি বন্য পশুপাখি শিকারে আকৃষ্ট প্রিয়। শিকারের জন্য তীর ধনুক এদের প্রধান হাতিয়ার। কাঠবিড়াল, সাপ, পাখী, ইঁদুর এদের খুব পছন্দনীয় শিকার। সাঁওতালী ভাষায় ইঁদুরকে বলে গুডো। এরা গুডো শিকারে বের হয় মাঘের শেষে। মাঠে ইদুঁরের গর্ত খুড়ে গুডো ধরার সময় ওদের সাথে থাকে চিতা। সাঁওতালী ভাষায় কুকুরকে বলে চিতা। ওদের মত চিতাও শিকার ধরায় খুব ধুরন্ধর। শিকারে গেলে চিতাও ওদের সাথে যায়।

সাঁওতালদের ঘরগুলো আকারে খুব ছোট ছোট। কুঁড়ে ঘর। একটার সাথে আর একটা ঘেঁষে ঘেঁষে তৈরী। ঘরগুলো পরিচ্ছন্নতার ছাপে নিকানো গোছানো। বেশ ছিমছাম। দেখতে তুন্দ্রা অঞ্চলে ইগলুদের

www.pathagar.com

বাড়ীঘরের মতো। ছোট একটা প্রবেশ পথ ছাড়া আলো বাতাসের আর কোন ব্যবস্থা নেই। আলো বাতাসহীন ঘরগুলো দেখলে মনে হয় এ যেন ওদের গুহাবাস জীবন ধারার প্রতিফলন। গ্রীষ্মকালে ঘরের ভেতরটা অগ্নিগর্ভ বলয়ের মতো তেতে থাকে বলে রাতের বেলায় ঘরের সামনে আঙ্গিনায় দড়ির খাট পেতে খোলা আকাশের নীচে সরাসরি শুয়ে রাত কাটায়।

সাঁওতাল পুরুষেরা পরে আটপৌরে ধুতি। মেয়েদের পরনে থাকে নয়হাতা মোটা শাড়ী। ছায়াব্লাউজ ওদের পরতে দেখিনি কোন দিন। গয়না হিসেবে দেহসজ্জায় মেয়েরা গলায় পরে দস্তার হাসুলী, হাতে ও বাজুবন্দে থাকে উল্‌কী। উল্‌কী মেয়ে পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করে। পুরুষ সাঁওয়ালদের বলা হয় মানঝি। তারা ধুমপানের জন্য শালপাড়ায় মতিহার তামাক মুড়িয়ে তৈরী করে চোঁটা। নেশার জন্যে তাদের মেয়েপুরুষ উভয়ের চোলাই মদ খুব পছন্দনীয়। সাঁওতাল পরিবারে মেয়েদের বলে কামিনী। দিনের শেষে অলস সন্ধ্যায় সাঁওতাল পাড়ায় মাদল বাজিয়ে মেয়ে পুরুষ একসাথে নাচগান করে মনের আনন্দ যোগায় হরহামেশা। কি সুন্দর সাঁওতাল পাড়ার কালোকালো সাঁওতাল কামিনীগুলো!

পৌষের শেষে সাঁওতালদের একটা উৎসব হয়। এই উৎসবের নাম পুষণা উৎসব। পৌষের শেষে এই উৎসব পালিত হয় বলে এর নাম হয়েছে পুষণা পরব। এটা তাদের জাতীয় উৎসবের মতো বড় উৎসব। পাতাঝোড়া একটা কলাগাছকে নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে ৫০ গজ দূরে পুঁতে রেখে তীর দিয়ে ঐ কলাগাছটিকে যে বিদ্ধ করতে পারে মানঝি সর্দ্দার তাকে বিজয়ী ঘোষণা করে। এই কলাগাছ বিঁধা খেলাকে বলা হয় সোহরাখেলা। সোহরাখেলার উৎসবমুখর দিনে সাঁওতাল পাড়ায় আনন্দে জোয়ার বয়ে আনে। এই উৎসব মুখর দিনে দারু এবং পিঠা খাওয়ার আয়োজন চলে তাদের ঘরে ঘরে। সোহরা উৎসবের দিনে সাঁওতাল কামিনীরা কোচা ও কাছা মেড়ে নতুন শাড়ী পরে। চুলের খোঁপায় দেয় বনফুল আর আমের টাটকা সবুজ পাতা। কোমড়ের চতুর্দিকে ময়ূর পুচ্ছ

www.pathagar.com

গুঁজে মনোরম সাজগোজ করে সারিবদ্ধ হয়ে একে অপরের হাতে হাত ধরে হিদাং হিদাং নাচগানে নিজেদের প্রকাশ করে উৎসব ছটার আনন্দ উল্লাস। কত অপূর্ব এই চোখ রাঙ্গানো মনোরম দৃশ্য! তাদের প্রাণ খোলা নাচের দৃশ্য দেখতে দেখতে মন হারিয়ে যায় অচিন দেশে। এভাবে আনন্দ পরিবেশের ভেতর দিয়ে সমাপ্ত হয় তাদের উৎসব পালন।

তাদের পুরুষেরা শুকনো কদুর খোলের তৈরী এক ধরনের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র এবং বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে কামিনীদের সাথে হেলেদুলে নাচগানের আনন্দ দান করে নিরলস বিচিত্র বর্ণবেশে। তাদের এই মাসুদী নাচ দেখতে মনিপুরি পাহাড়ী নাচের মতো খুবই মনোমুগ্ধকর। এই সাঁওতালী নাচ উপভোগে সবার মনে জাগিয়ে তোলে এক বিস্ময়কর অনুভূতি। ঠিক যেন আনন্দের পরিবেশে হারিয়ে যাওয়ার মতো।

সাঁওতাল পাড়ার কুশো সাঁওতাল ছিল বেশ রসিক লোক। আকৃতিতে অনেকটা হিমালয়ের সানুদেশে ভুটিয়াদের মত খাটো চেহারা। গায়ের রং আদিবাসী তামিলী বর্ণের মতো কালো কুচকুচে। তার চোলাই মদ ছিল নুন পান্তাভাতের মত নিত্যদিনের খোরাক। মদ না গিল্লে তার দিন কাটে না। সোহরা উৎসবের দিনে সে খড়কুটো দিয়ে একটা পাঁজালীর মত বাঁদর তৈরী করে। তাতে ছেঁড়া ময়লাকাপড় জড়িয়ে চুনকালি দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে নিজের মুখেও চুনকালি মেখে সং সেজে রংঢং করে গ্রামের দুয়ারে দুয়ারে সাঁওতালী ভাষায় মাতাল সুরে গান গেয়ে গেয়ে কিছু বকশিস আদায় করে নিতো। তখন পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা নগ্নদেহে পরনে হাপপ্যান্ট, অনেকে বিবস্ত্র হয়ে হৈচৈ করে দলবেঁধে কুশো সাঁওতলের পিছনে পিছনে ছুটে যেতো। খড়কুটোর কৃত্রিম বাঁদর নাচ দেখার আনন্দ উপভোগের জন্যে। তখন মনে হতো গোটা সাঁওতাল পাড়াটা যেন খালি হয়ে গেছে।

আমার শৈশব স্মৃতির আর একটা আকর্ষণ গ্রাম্যমেলা। আমার গ্রামে প্রতি বছর একটা মেলা হয়। মেলা বসে গ্রামের বাইরে এক বিস্তৃত জায়গা জুড়ে। মেলাতলার উত্তর পাশে আছে একটা লম্বা জলাশয়। দেখতে দিঘির মত। পানির রং স্বচ্ছ ফটিকজল। রাতে আকাশের চাঁদ জ্যোছনার

www.pathagar.com

আলো হয়ে বেড়িয়ে এসে বিলের পানির ঝিলমিল ঢেউ তরঙ্গের সৌন্দর্য সবার মনকে করে দেয় চঞ্চলাচ্ছন্ন। রাতের জ্যোছনা বিলের নির্মল পানিতে যখন খেলা করে তখন বিলের পানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে ফুটে ওঠে হীরা পান্নার মত আনন্দের অভিষেক। বিলের পাড়ে পাড়ে প্রকৃতি তার সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে দুহাত ভরে। গ্রামের মানুষের কাছে এই সুন্দর জলাশয়টি বিল নামে পরিচিত। এই বিল আমার স্বপ্ন। বিলকে ঘিরে আমার শৈশবের সব কথা মনে আছে। চাঁদমাখা রাতে বিলের ঝিলমিল পানির দৃশ্য আজও ভুলিনি। কি সুন্দর! রাতের সেই জ্যোছনা ভরা রূপ।

গ্রাম্যমেলা সব সময় একটা নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে থাকে। আমার গ্রামের মেলাও একটা নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে আসছে অতীত কালক্রম থেকে। মেলা বসে প্রতিবছর পয়লা চৈতে। তখন বসন্ত কাল। গ্রীষ্ম নামতে দেরী থাকে।

গ্রাম্যমেলা বসার পেছনে লুকিয়ে থাকে কোন না কোন একটা কারণ। সামাজিক কারণ, ধর্মীয় কারণ অথবা ঐতিহাসিক কারণ। এর যে কোন একটা কারণ থাকে মেলার পেছনে। হিন্দুগ্রামে মেলা বসে সচরাচর ঠাকুর দেবতার নামে। দেবতার স্মরণে ঢাকঢোল বাজিয়ে উৎযাপিত হয় ধর্মের নামে গ্রাম্যমেলা। মেলার সময় ঘনিয়ে এলে পূজার আয়োজনের সাথে চলে সকল কর্মকাণ্ড।

মুসলমান গ্রামে মেলা বসে পীর দরবেশদের নামে। আমার গ্রামের মেলা বসার মূল কারণটা কি তা আমার স্পষ্টত জানা নেই। আমি তখন বয়সে ছোট। নেহায়েত নাবালক। যে কারণে এ বিষয়ে আমার মনের ভেতর জানার আগ্রহ বিকাশ হয়নি। আমার গ্রামের মেলা কোন্ পূর্বপুরুষের আমল থেকে শুরু হয়েছে তাও আমি জানিনা। হয়তো কোন পীরের নামেই উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে আমার গ্রামের মেলা। কারণ যাই হোক, গ্রাম্য মেলা সমাজ সংস্কৃতির একটা প্রতিফলন। আসলে মেলার উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রাম্য সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের মন-মানসে আনন্দ বিনোদন জাগিয়ে তুলে মনকে চাঙ্গা করা। এটা গ্রাম্য সংস্কুতির আনন্দ মিলন। একটা একটা করে বারটা মাস পেরিয়ে পেরিয়ে ফিরে আসে এই

www.pathagar.com

গ্রাম্য মেলা। ক্লান্তিময় মানুষের মনে ফিরিয়ে আনে সংস্কৃতিময় আনন্দ উচ্ছ্বাস এবং দূর করে মনের এক বছরের সঞ্চিত পুরোনো অবসাদ।

গ্রাম্য মেলায় মানুষ মানুষকে কাছে টেনে হৃদয়ের মিলন ঘটায় এবং গ্রাম্য সংস্কৃতির চেতনাকে আকৃষ্ট করে তোলে।

মেলার সকল আয়োজনের জন্য গ্রামের আনোয়ার হাজী সাহেব ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। গ্রামের সবাই তাকে ছোট হাজী সাহেব বলে ডাকতো। তিনি আগে থেকে সব কিছুর পরিকল্পণা নিয়ে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতেন। আয়োজনে কোথাও কোন ত্রুটি থাকতো না। খুঁটিনাটি সবই নিঁখুত ভাবে চলতো।

মেলার তারিখ আমার জানা। আগে থেকেই আমি অবহিত থাকতাম মেলা আসছে, মেলা বসবে, মেলা হবে। কি দারুণ আনন্দই না লাগতো! মনটা মেলার আনন্দ লোভে নাচতে থাকতো বুক ভরা আনন্দে। আগমনের দিন যতই ঘনিয়ে আসতো আমার মনের অস্থিরতার আকর্ষণও ক্রমেই বেড়ে উঠতো। মেলার কটা দিন পড়াশুনার সকল কাজ জলাঞ্জলি দিয়ে মাথায় উঠতো। মনটা পড়ে থাকতো মেলা তলায়।

মেলা স্থায়ী হোত তিনচার দিন। গ্রামের মানুষের চিত্ত বিনোদনের জন্য সবচেয়ে বড় আয়োজন ছিল লেটোর যাত্রাগান। তিন চার রাত লেটোগান চলার সময় আশেপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে আসা নানা বয়সের লোকে লোকারণ্য হয়ে মেলাতলাটা ভরে উঠতো। নানা রং বেরং কাগজের ফুল ও ফুলের স্তবক দিয়ে যাত্রাগানের মঞ্চটি সুন্দর করে সাজানো হতো। রাতে যাত্রা গানের প্রারম্ভে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের মুখরিত সুরে মেলাতলাটা আনন্দ কোলাহলে ভরে উঠতো। মঞ্চের চার কোণায় ডে-লাইট এবং হেজাক জ্বেলে সারা মেলাতলার চতুরদিকে মাইল খানেক দূর পর্যন্ত আলোয় ঝলমল করতো। সন্ধ্যার প্রথম প্রহরের পর শুরু হতো যাত্রাগান। ছেলেরাই সব চাইতে আনন্দ পেত বেশী। সন্ধ্যে পার হতেই ছেলের দল মঞ্চের চারদিকে বসার জন্য চট এবং মাদুর পেতে আসন দখল করে হৈচৈ আনন্দ কোলাহলে অপেক্ষায় থাকতো। দর্শকরা বসতো একটু দূরে ছেলেদের পেছনে।

www.pathagar.com

লেটোদলের আধ জোয়ান ছেলেদের গোঁপ কামিয়ে সাজঘরে রোজ পাউডারের মেকাপ দিয়ে মেয়েলী পোষাক পরিয়ে সখী সাজিয়ে উজ্জ্বল করা হতো। দলের তরুণ ছেলেরা পায়ে ঘুঙুরের বেলোয়ারী ঝাঁড় বেঁধে সখী সেজে মিহি কণ্ঠসুরে নজরুল গীতি গেয়ে মঞ্চের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে দর্শকদের নিরলস আনন্দ দিত। তাদের পায়ের বেলোয়ারী ঘুঙুর বাজার তালে তালে বেজে উঠতো হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা এবং আরও কতবাদ্য যন্ত্রের মধুর মূর্ছনা।

নাচ পর্বের পর রাজরাজাদের ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে আরম্ভ হতো মঞ্চ নাটক। নাট্য শিল্পীরা অভিনয় করে দর্শকদের যতটা খুশী করতে চেষ্টা করতো দর্শকেরা অতোটাই আনন্দ পেত। সে যুগে মাইকের ব্যবহার ছিলনা। অভিনেতারা গলা খুলে অভিনয় করতো যাতে অনেক দূর অবধি শোনা যায়। অভিনয়ের অঙ্গভঙ্গি, গানের সুর, নাচের কায়দা দেখে সবাই মহিত হোত। এভাবে সাড়াটা রাত কেটে যেত মেলাতলায় যাত্রা গানের আনন্দ উল্লাসে। মেলা শেষ হলেও আনন্দের রেশ আমার কাছে ফুরিয়ে যেত না। আনন্দের ঢেউ বইয়ে দিতো আমার মনের গভীরে। এতো তাড়াতাড়ি কটাদিন কেমন করে কেটে যেত তাতে মনে আপসোস হোত। মেলা শেষ হলেও মেলার সব কিছু চোখের সামনে ভাসতো।

সারা মেলাতলাটা নানা দোকানপাটে সেজে থাকতো বিকিকিনির আনন্দে। দিনের বেলায় মেলার সময়টা অফুরন্ত আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে দিতাম। মেলায় ঘুরে ঘুরে সুন্দর সুন্দর নানা পণ্যের দোকান দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো। মেলাতলার গমগমে আবহাওয়ার আমেজ আমার বড়ই ভালো লাগতো। মেলায় ঘুরে বেড়ানোর আকর্ষণ আমার ছোট বেলার জীবনকে করে তুলতো আমোদ পিয়াসী। আমার বেশী ভালো লাগতো নাগর দোলায় চাপা এবং সার্কাস দেখা। সেই সাথে রাতের লেটোগান শোনার আনন্দ তো আছেই। মেলার আনন্দ উৎসব আমার মনের ভেতর বিস্তৃত পরিসর দখল করে আছে আজও।

মেলা বসার আগের রাতে মেলাতলায় একটা প্রীতিভোজের আয়োজন হোত। এই আয়োজনে থাকতো ভাতের সাথে কেবল মাত্র

www.pathagar.com

একটা নিরামিষ তরকারি। এটা ছিল পালপার্বনের মতো একটা আনন্দ ভোজ। ভোজ আয়োজনের আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হয়ে মেলার রাতটাকে জমজমাট করে তুলতো। অনেকে আগ্রহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো খাওয়ার জন্যে। গ্রামের ছেলেবুড়ো সকলেই সারি সারি বসে শালপাতার পাতে আহার পর্ব শেষ করতো। খেয়ে খুশী হতো সবাই এবং এর আনন্দই ছিল আলাদা। এটা কোন ক্ষুধার আহার নয়। প্রাণে সারা জাগানো একটা তৃপ্তি ভোজ। খাবার উপভোগটা সবচেয়ে ছেলেদের মধ্যে ছিল উপচে পড়া আনন্দ। রাত জেগে ভোজপর্বের এই দারুণ আনন্দ উপভোগের জন্য আমিও আগেভাগে পাড়ার ছেলেদের সাথে মিশার জন্য অপেক্ষায় থাকতাম। আমার ভোজতৃপ্তির অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বুঝাতে পারব না শালপাতার পাতে ভোজযজ্ঞ আমার জীবনে কতখানি স্থান দখল করে আছে।

হরিণডাঙ্গা গ্রামে আমার জন্ম। আমার বাপদাদার জন্ম। আমার পরম শ্রদ্ধার মাতৃভূমি। অতি প্রেম ভালোবাসা ও মায়ামমতার পল্লীজীবন। ধূলি মলিন এই গাঁয়ের প্রাকৃতিক রূপের দৃশ্য আমার কাছে বৈশিষ্ট্যের অনাবিল আনন্দ। জন্মভূমির কোলে আমার জীবনকে বিকশিত করতে না পারলেও মাতৃভূমির মমত্ববোধ আমার মনের তলদেশে বিরাজমান। দেশের মাটি আমার কাছে অনেক আরাধনার, অনেক উদীপ্ত এবং সমপরিমাণে পবিত্র।

জন্মভূমি প্রতিটি মানুষের কাছে বাঁচার জন্যে আমরণ আকাঙ্ক্ষা। মনের অনুভূতি নিয়ে আমার বসবাসের বাড়ীটার নামাঙ্কিত করেছি "হরিণডাঙ্গা স্মরণী"। এতে আমার জন্মভূমির প্রতি ভালবাসার গৌরব অনুভব করি। আজও আমার হৃদয়কে সব সময় চম্বুকের মত আকৃষ্ট করে একটি গ্রাম যার নাম "হরিণডাঙ্গা"। আজ আমি নিজ গ্রাম থেকে বিচ্যুত হয়েছি, হয়েছি গৃহভ্রষ্ট। এজন্য আমি দূর হতে দূরে অনেক দূরে অশান্ত প্রবীণ জীবন ইতিহাস হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছি। আমার গ্রাম আমার সুখের দিনের জননী এবং দুঃখের দিনেরও জননী জন্মভূমি, আজও আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। প্রকৃতির সৌন্দর্য সাজিয়ে রেখেছে আমার জন্মভূমি

www.pathagar.com

হরিণডাঙ্গাকে। তাই আমার উদাস মনটা ছুটে যেতে চায় প্রকৃতির টানে, আমার জন্মভূমির কোলে।

আজ আমার পিতামাতা কেউ বেঁচে নেই। বহু আগে তাঁরা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। আজ তাঁদের নিয়েই আমার এই লেখা। আমার পিতার নাম আব্দুস ছামাদ। মায়ের নাম হালিমা খাতুন। তিনি ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের একজন সাধারণ মহিলা। আম্মা আমায় সকাল সন্ধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ এবং বেনীমাধবের ধারাপাত পড়াতেন সে কথা আমার বেশ মনে পড়ে। পিতা ছিলেন ইংরেজ শাসন আমলে স্কুল শিক্ষায় নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা। তিনি প্রথম জীবনে পুরুলিয়া জেলায় কয়েকটা বছর চাকরি করে গ্রামের বাড়ীতে চলে আসেন। চাকরি ভাল না লাগায় গ্রামে ফিরে এসে শুরু করেন গ্রাম্য মক্তবে শিক্ষকতা।

আমি ছিলাম আব্বা আম্মার বড় ছেলে। সখ করে নাম রেখে ছিলেন মোহাম্মদ আবুল হোসেন। শৈশবে আমার আর একটা পুরোনো নাম ছিলো। নামটা শুনতে অন্য রকম হলেও বেশ ঘরোয়া ঘরোয়া ভাব। গ্রামের অনেকে আদর করে আমাকে কচি বলেই ডাকতো। আমি বড় হতে থাকায় সবার মুখে কচি নামটা আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যায়।

নানারবাড়ী আমার গ্রাম থেকে কম পক্ষে চব্বিশ পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে সবুজে ঘেরা এক নির্জন পল্লী। গ্রামটির নাম সারগাছি। এই সারগাছি গ্রামে সে যুগে নানাজান ছিলেন একজন বিদ্যানুরাগী খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি মুসলমান ছেলেমেয়েদের জন্য নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করলেন একটি জুনিয়ার মাদ্রাসা। প্রতিষ্ঠানটির নাম দিলেন "সারগাছি পল্লীমঙ্গল জুনিয়ার মাদ্রাসা।" নানাজানকে মুসলিম পরিবারে লোকদের দ্বারে দ্বারে প্রার্থী হতে হয়েছে তাদের ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসায় পাঠাবার জন্যে। মাদ্রাসাটি চালু করে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রথম দিকে তাঁকে অমানুষিক কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। তিনি ছিলেন এক কথার শক্ত মানুষ। লোকে বলতো কাজী সাহেব যা বলেন তাই করেন। নানাজানের নাম কাজী আব্দুল আজিজ, সকলে কাজী সাহেব বলেই ডাকতো।

www.pathagar.com

নানাজান কোন এক সময় পিতার কাছে ফমরান পাঠালেন "তোমার সন্তানকে আমার মাদ্রাসায় লেখাপড়ার জন্য পাঠিয়ে দাও"। এই সংবাদে পিতা খুশী হলেও আম্মা খুব একটা আগ্রহ দেখাতে না পাড়লেও ছেলের লেখাপড়ার জন্যে কোন আপত্তি করতে পারেনি। তড়িঘড়ি করে ক'দিনের মধ্যে যাওয়ার সকল প্রস্তুতি ঠিক হয়ে গেল। পিতার সাথে নানার বাড়ী পড়তে যাব শুনে মনটা চমকিয়ে উঠলো। খেলাধূলা সব নষ্ট হয়ে গেল। গ্রাম, বাড়ীঘর, খেলার সাথী সবকিছু ছেড়ে যেতে হবে। কষ্টে মনটা এলোমেলো হয়ে গেল। কিছুই যেন ঠাহর করতে পারিনা।

আমার ছোট বেলার খেলার সাথী, নাম কাদু। যাবার কথা শুনে সে তার মুখটা কালো করে বললো, কিরে আমাদের ছেড়ে চলে যাবি? তার মুখের পানে তাকিয়ে বললাম, আমারও খুব খারাপ লাগবেরে। দেখিস ছুটিতে ছুটিতে এসে কত মজা করে তোর সাথে খেলবো। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে বিলে ছিপ দিয়ে মাছ ধরবো। ছেলেবেলা ছিপ দিয়ে মাছধরা ছিল একটা বাতিক। দুজনে ছিপ দিয়ে বিলে মাছ ধরতাম, বড় আনন্দ পেতাম। যাবার দিনে সে অভিমানে থাকলো। এদিনে তার সাথে খেলাধূলা হলোনা। সারাদিনে একবার দেখা করতেও এলো না। সেদিন আমিও মায়ের কাছ ছাড়া দূরে থাকিনি।

এক সাথের ছেলেবেলা। কেউ কাউকে ছাড়তে চাই না। একসাথে বটতলা পুকুরে স্নান করতে এসে পানিতে ঝাপাঝাপি করে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। গা মুছে দুজনে বাড়ী ফিরতাম। পরন্ত বিকেলে বিল পাড়ে তাতে আমাতে বসে বসে কত গল্পগুজব করতাম তার ঠিকানা ছিল না। তখন বিকেলগুলো রোমাঞ্চ হয়ে ধরা দিত। কাদু আমার শৈশবের খেলার সাথী। ছেলেবেলার বন্ধু। দুজনের সখ্যতা ছিল বড় গাঢ়। দুজনের ভেতর বয়সের বারটা ছিল সমান সমান। সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে ভবপারে। তার কথা ভাবতে গেলে শোকাভিভূত হয়ে পড়ি। চোখের কোণায় কোণায় অশ্রুবিন্দু ছলছল হয়ে ওঠে। থাক তার কথা। মরা মানুষের কথা ভেবেই বা কি হবে? যারা বেঁচে আছে তাদের কথা ভাববার সময় কোথায়? সে চলে গেলেও আমার ছোট বেলার আবেগময়

www.pathagar.com

স্মৃতিগুলো আজও মুছে যায়নি।

গরুর গাড়িতে চড়ে যাব নানার বাড়ী। গরুর গাড়ি ঠিক করা হলো। তখনকার দিনে যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল গরুরগাড়ি। যাবার দিন ছইবাঁধা গরুর গাড়িতে খড়ের গদি বানিয়ে খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে ঘুমানোর জন্যে আম্মা একটা বালিশও দিয়েছিল। রাতের আহারাদি শেষ করে আম্মা পরনের হাপপ্যান্ট, পাজামা, গেঞ্জি, শার্ট এবং খান কতক পড়ার পুরোনো বইখাতা একটা খুদে টিনের সুটকেসে ভরে তুলে দিলো পিতার হাতে। আম্মার কাছে শুনেছি তখন আমি বয়সে সাত। আম্মাকে ছেড়ে যেতে মন চাচ্ছিলনা। পিতার ভয়ে কাঁদতেও পারিনি। অনাহুত অশ্রু রোধ করতে পারিনি। আমার চোখের পানি দু'গাল বেয়ে ঝড়তে দেখে আম্মা বারবার শাড়ীর আঁচল দিয়ে নিজের চোখদুটো মুছতে থাকে। স্নেহমাখা হৃদয়ে আম্মা আমার কপালে স্নেহের চুমো দিয়ে রাতের অন্ধকারে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বাড়ির সদর দরজার কাছে গাড়িটা না ছাড়া পর্যন্ত। আমি মাথাটা মাটির দিকে নিচু করে খুব ধীরে আম্মার পা ছুঁয়ে আর একবার কদমমুসি করে পিতার সাথে গাড়িটাতে উঠে গেলাম।

থমথমে ঘন আঁধার। রাতের আকাশের তারাগুলো তখন মিটমিট করে জ্বলছে। ছায়াছায়া সন্ধ্যা অনেক আগেই মিলিয়ে গেছে। পাখীদের আহার খোঁজার সময়ও শেষ হয়ে গেছে। বাড়ীর পূর্ব পাশে আকাশচুম্বী বিরাট ঘনবাঁশবাগান। বাঁশবাগানে বাঁশের ডগায় ডগায় পাতার আড়ালে আড়ালে পাখীদের রাতের আলয়। রাতের মৃদু সমীরণ বয়ে আসছে বাড়ীর পূর্ব দিকের সেই ঘন বাঁশবন থেকে। গাছের পাতার আড়ালে আড়ালে শালিক পাখীর একটানা কিচির মিচির গানের কাকলী থেমে গেছে অনেক আগে।

রাতের আঁধারে গাড়োয়ান গাড়িটা ছেড়ে রওনা দিল দূরের সেই গ্রামের দিকে। গাড়ির নীচে ঝুলিয়ে দিল একটা জ্বালানো হারিকেন। গাড়িতে গাড়োয়ান ছিল ছকু আলী বলে একজন লোক। খুব একটা বয়স ছিল না তার। বড় জোর চল্লিশ। দেখলে মনে হতো বুড়ো হওয়ার পথে। চুলেও কিছুটা পাক ধরেছে গাড়ির চাকা ঘুরতে ঘুরতে মন্থর গতিতে গ্রাম

www.pathagar.com

ছেড়ে আঁকাবাঁকা এবড়ো থেবড়ো মেঠো গেয়ো পথ ধরে আগাতে থাকে আমাদের গাড়ি। রাতের কৃষ্ণকালো। আঁধার ভেদ করে গাড়োয়াল গাড়ি হাঁকিয়ে চলছে। আমি তখনও ঘুমুইনি। ঘুম ঘুম ঘোরে শুয়ে শুয়ে কি সব ছাইপাঁচ ভাবছি। হঠাৎ কানে এলো বনশিয়ালের ডাক। একটা দুটো তার পর অনেকগুলো শিয়াল একসাথে ডেকে উঠলো। মনে হলো শোকের পাড়া থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে শিয়ালের ডাক আর শোনা গেলনা। আমি মোটেই ভয় পাইনি। গ্রামের ছেলে রাতেরবেলা এরকম ডাক কত শুনেছি।

আমার গ্রামের পশ্চিম দিকে আছে একটা ছোট নদী। নদীটার নাম বাঁকা নদী। এঁকে বেঁকে চলে। বর্ষাকাল ছাড়া নদীটা সব সময় হাঁটুর নীচে পানি কুলকুল রবে বয়ে চলে। গ্রীষ্মকালে নদীটা হেঁটে হেঁটে পার হওয়া যায়। বর্ষাকালে পানির তোড়ে নদীটা হয়ে ওঠে খরস্রোতা। নদীর পাড়টা ঢেউয়ের মতো উঁচুনীচু। এর অপর তীরের ধারেধারে ঢেকে আছে বনজঙ্গলে। কোথাও কোথাও বনকুলের ছোট ছোট ঝোপঝাড়। টোপা টোপো কুল গাছ ভরে পেকে আছে। সোঁধা সোঁধা গন্ধ ছড়াচ্ছে চারদিকে বাতাসের ছোঁয়া পেলে কুলগাছের ডগাগুলো হাওয়ার তালে তালে দুলতে থাকে। কোথাও আবার একরাশ স্বর্ণলতা ঝোপের উপর সেটে আছে পাক খেয়ে খেয়ে।

বন জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে শিয়ালের গর্ত। গর্তের ভেতরে লুকিয়ে থাকে রাতের শিয়ালগুলো। দিনে ঘুমিয়ে থাকা শিয়ালগুলো আহারের খোঁজে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসে রাতের বেলা। ব্যাস, শুরু হলো উদ্রব। ছাগল হাঁস মুরগি যেখানে যা পায় ধরে নিয়ে যায়। ছাগলটার কণ্ঠনালী কেটে ফেলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কামড়িয়ে কামড়িয়ে খেয়ে শেষ করে দেয়। গেরস্তের পিণ্ডি চট্‌কে দেয় রীতিমতো রাতের অন্ধকারে। কেউ টেরও পায়না।

এই নদী পাড়ে আছে একটা ছোট্ট গ্রাম। আমটে গ্রাম। অখ্যাত ছোট গাঁ। কয়েক ঘর দুলেবাগদির বাস। গ্রামটাতে খান কায়েক ছোট ছোট মাটির কুঁড়ে ঘর। ঘরগুলোর কয়েক গজ দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে

www.pathagar.com

এক সারি, দুসারি করে আট দশটা উঁচুউঁচু তালগাছ। অনেক দিনের গাছ। বয়সে বুড়ো হয়েছে। তালপাতার ডগায় ডগায় ঝুলছে বাবুই পাখিদের বাসা। বাসাগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রকমারি ডিজাইনে খাসা বুনন। বলিহারি! কারুশিল্পের মতো ওদের কারুকার্য, দেখতে এতোই চমৎকার! কুঁড়ে ঘরগুলোর পিছনে সামান্য একটু দূরে গোটা কয়েক বেঁটে বেঁটে খেজুর গাছ।

গাড়িতে শুয়ে শুয়ে মায়ের জন্যে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি জানিনা। ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন ভোরের পূর্বাকাশ পরিষ্কার হয়ে সূর্যের উদ্ভাসিত আলো দিনের নাগালে এসে গেছে। গাড়িটা আস্তে আস্তে এসে গাঁয়ে ঢুকে থামলো নানাজানের খানকা বাড়ীর সামনে। তখন তিনি খানকা ঘরের দাবায় একটা কাশ্মীরি কম্বলের উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে প্রভাতী আনন্দে আয়েশ করে দরবারি হুকোর নলচেয় দম দিয়ে অম্বরী তামাকে টান দিচ্ছেন। পিতা গাড়ি থেকে নেমে নানাজানকে হাত তুলে সালাম দিয়ে তাঁর কাছে বসে গেলেন। আমিও গাড়ি থেকে নেমে সবার পায়ে হাত দিয়ে খপখপ করে সালাম করে বাড়ির অন্দর মহলে একটা ঘরে গিয়ে বসলাম। নানীজান হনহন করে এসে আমাকে কাছে পেয়ে আনন্দে চমকে উঠলো। আদর করে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে গালে আবার একটা চুমু দিয়ে বলল, সোনাভাই ক-তো বড়ো হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম, নানী তুমি কেমন আছ? আমার ডানগালে একটা আদূরে টিপ দিয়ে বলল ভালো, খুব ভালো। 'বসো ভাই। তোমার জন্যে মুড়ি নিয়ে আসি একথা বলে ব্যাস্ত হয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে গেল কাঁসার পেয়ালা ভর্তি গরুর দুধ, এক পেয়ালা ক্ষেতের আখের গুড় এবং বাসন ভর্তি মুড়ি। হাত মুখ ধুলাম। নানী কাছে বসে আদর করে নাস্তা খাওয়ানোর কাজটা শেষ করলেন।

একটু পরে পিতাকে খনকাবাড়ী থেকে ডেকে আনা হলো। তিনি এসে আমার ঘরে নক্সা করা মাদুরের উপর বসে গেলেন। আরম্ভ হল নাস্তার আয়োজন। ফুলতোলা দস্তরখানটি বিছানো হল বিছানার উপর। পাশে রাখা হলো পানির জগ, কাঁচের গ্লাস এবং হাত ধোয়ার জন্যে একটু

www.pathagar.com

দূরে রাখা হলো পিতলের একটা চিলুমচি। দামী বাসনে সাজানো আছে কয়েকটা পরটা আর এক প্লেটে খান কয়েক ফুলকো লুচি, ডিম ভাজা, ঝিরঝিরি ননিতাল আলু ভাজা এবং আর একটা প্লেটে পানতোয়া এবং রসগোল্লা। এসব নাস্তাসামগ্রী দিয়ে সাজানো হলো দস্তরখানাটা। আমি আবারো রসনা তৃপ্তির অভিলাসে পিতার সাথে নাস্তায় শরিক হয়ে কেবল একটা রসগোল্লা এবং আর একটা পানতোয়া মুখে দিয়ে ঢগঢগ করে আধ গ্লাস পানি পান করে উদরের ষোলআনা পূর্ণ করে দু'একটা উদগার তুল্লাম।

ঘরে থেকে শুনতে পেলাম ঘরে পোষা মুরগীর কক্‌কক্‌ ডাক। বুঝলাম এসবই হচ্ছে পিতার ভোজের আয়োজনের জন্যে। বাড়ির খিড়কি দরজার সামনে আছে একটা বড় পুকুর। সবাই বলে পানাপুকুর। পানাপুকুরে পানা নেই। স্বচ্ছ পানি ঢেউ খেলে সারাক্ষণ অথচ কেমন করে পানাপুকুর নাম হলো আমার জানা নেই। লুঙ্গীতে মালকোঁচা মেরে জনাকয়েক লোক নেমে পড়লো পুকুরে। হিরিক পড়ে গেল জাল দিয়ে মাছ ধরা। হৈচৈ করে ধরা হলো বড় একটা রুইমাছ ও কিছু টেংরাপুঁটি। মেয়েদের রান্নাবান্নার ঝামেলা শেষ হলে দুপুরে এবং রাতে খাওয়া দাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা হলো। কি কথা হলো আমি জানি না। তবে পিতার সাথে দ্বিপ্রহে মজা করে মহাভোজ শেষ করলাম।

রাতের আহারাদি শেষে পিতার সাথে নানাজানের অনেক কথাবার্তা বিনিময় হলো। কি কথা হলো আমি জানি না। তবে আমার পড়াশুনার ভবিষ্যৎ নানাজানের হাতে সঁপে দিয়ে পরের দিন সকালে তিনি ঐ ফিরতি গাড়িতে বাড়ি ফিরে গেলেন। যাবার সময় আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, দুষ্টমি করোনা। মনদিয়ে পড়াশুনা করো। সাবধানে থেকো। আমি আবার এসে তোমাকে দেখে যাব। পাশে দাঁড়িয়ে তখন ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিলাম। বাবামা, ছোট ভাইদের কাছ থেকে একা হয়ে গেলাম ভেবে মনটা আবারও খারাপ হয়ে উঠলো। মনের ভেতরে বড় কষ্ট পেলাম। মমতার গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম ভাবতে ভাবতে সবকিছু এলোমেলো হয়ে ভেতর থেকে কান্না এলো। তখন নিজেকে দমন করতে পারিনি। পিতার পাশে দাঁড়িয়ে মাথাটা নিচু করে

www.pathagar.com

কেঁদে উঠলাম। অনেকক্ষণ কাঁদছিলাম। দেখলাম পিতারও একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, কেঁদোনা বাবু। চোখ দুটো মুছিয়ে দিয়ে আবারও বললেন কেঁদোনা সবাই খারাপ বলবে, ছিছি দেবে। তারপর তিনি এটা সেটা বলে বলে আমায় সান্ত্বনা দিয়েও চুপ করাতে পারেননি।

বাড়ীর বাইরে থেকে গাড়োয়ান ডাক দিলে পিতাপুত্রের মাঝে আর কোন বাক্যালাপ হলো না। তিনি ধীর পায়ে সামনের দিকে হাঁটতে থাকেন। আমি নিঃসহায় ভাবে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম স্নেহের পিতার দিকে, তখন বুকের ভেতরটা যেন টনটন করে উঠলো। মনের আবেগ ধরে রাখতে পারিনি। মনে হলো আমাকে আদর করে দেখাশুনার কেউ থাকলো না। তারপর–

পিতা চলে যাওয়ার দুদিন পরে নানাজান আমাকে তাঁর মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিয়ে হেড মাস্টার সাহেবকে বলে দিলেন, একটু খেয়াল রেখেন ছেলেটা বাবা-মা ছেড়ে অনেক দূর থেকে এসেছে। মাস্টার সাহেব আমাকে কাছে ডেকে বললেন, এ স্কুল তোমার কেমন লাগছে? প্রশংসার ভঙ্গিতে খুব ছোট্ট গলায় বললাম ভালো। মনে হলো তিনি যেমন রাশভারী লোক তেমনি তাঁর গুরুগম্ভীর স্বভাব। একটু পরে আর একজন শিক্ষক এসে আমাকে ডেকে নিয়ে শিশু শ্রেণী ক্লাসে বসিয়ে বললেন, তুমি প্রত্যেক দিন এখানে বসবে। মুখে কিছু না বলে শুধু ইশরায় ঘার বেঁকিয়ে সায় দিলাম।

গ্রামের বাইরে উত্তর দিকে মাদ্রাসা ঘরটি অবস্থিত। মাটির ঘর, খড়ের চালা। কাদামাটি লেপে তৈরী। পাশের দু'দিকে বিস্তৃত সোনালী ধানক্ষেত। পশ্চিমে ঘন আমবাগান। মাঘমাস। আমের মুকুলের মিষ্টি মিষ্টি ঘ্রাণ ভুরভুর বাতাসে ভেসে আসছে এদিকে। সামনে কাজলাদীঘির মত একটা পুকুর। স্বচ্ছপানির ফটিক রং। পদ্মকলির ফুলে ফুলে ভরে আছে পুকুরটা। মৌমাছিরা উড়ে উড়ে ফুলের কমল কেশর থেকে মধু নিচ্ছে গুণগুনিয়ে।

এখান থেকেই আমার শিক্ষা জীবনের সূচনা। জানুয়ারি মাসে নতুন ক্লাসের পড়া শুরু হলো। এটাই ছিল আমার স্কুল জীবনের প্রথম দিন।

www.pathagar.com

বিদ্যালয়ের বিধি নিষেধ এর আগে কিছুই বুঝতাম না। জানতাম না নিয়ম শৃঙ্খলা কাকে বলে। আমার নতুন জীবন সত্তার মাঝে বিদ্যালয়ের সকল নিয়ম শৃঙ্খলা আমাকে আস্তে আস্তে আবদ্ধ করে ফেললো বাধ্যতার নিয়মে। ক্লাসের সমপাঠীদের সাথে নতুন পরিবেশে বাঁধা পড়ে গেলাম। সেই সুন্দর দিনটার স্মৃতি আমার মনে দাগকেটে রেখেছে। আজও ভুলিনি শিক্ষা জীবনের এই প্রথম দিনটি। এভাবেই আমার শৈশবের দিনগুলো সারগাছি গ্রামে অতিবাহিত হতে থাকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহভরা আকর্ষণে।

আমার স্কুলজীবন ছিল আনন্দের সমারোহে ভরপুর। সন্ধ্যা হলে ঘর বারান্দায় হারিকেনের সলতে জ্বালিয়ে বই খুলে পড়তে বসতাম। ধারাপাত, বাংলা, ছোটদের ভূগোল সব পড়াগুলো হরহর করে মুখস্থ করে নিতাম। কিছুটা রেষারেষি করেও মনদিয়ে পড়তাম।

সারগাছি গ্রামে ক্রমেই আমার জীবন প্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠতে থাকলেও নিজের গ্রামকে ভুলতে পারিনি। গ্রামে ফেলে আসা মিষ্টি দিনগুলো আমার বারবার মনে পড়তো। যত দিন যায় আমি আস্তে আস্তে এখানকার সব কিছুতে মানিয়ে নিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। পাড়ার ছেলেদের সাথে আমার ভাব হয়ে গেল। তাদের সাথে হৈচৈ করার অভাবটা প্রাণ ভরে মিটিয়ে নিলাম। গ্রামের ছেলেদের সাথে খেলাধূলা থেকে আরম্ভ করে মাতাপুকুরে গভীর পানিতে গা চুবিয়ে, মাথা ডুবিয়ে গোসল করা, মাঝ পুকুরে চিৎসাঁতার, উপুরসাঁতার, ডুবসাঁতার, ঝাঁপটাসাঁতার কত রকমের সাঁতার কেটে গোসল করা, কত যে আনন্দ তা আজকের আধুনিক বাথরুমের আনন্দের চেয়ে আরও বেশী আনন্দ। ফাগুনের মিষ্টি দুপুরে তরতর করে আমগাছে উঠে মগডাল থেকে কাঁচা আম পারা, দুপুরের ভ্যাপসা গরমে গাছতলায় বসে বসে নতুন বন্ধুদের সাথে নিয়ে কাঁচা আম খাওয়া, জামগাছের ডালে বসে পাকা জাম খাওয়ার আনন্দ আমার ছেলেমানুষীকে আরও উৎসাহিত করতো। ডাল ভেঙ্গে নিচে পড়ে গেলে পরিণাম কী হবে আমি বাল্যে নাবালক বলে হয়তো বুঝিনি। গেরস্থের চোখে ধূলো দিয়ে ক্ষেতের শশা, মুলো, গাছ গাছ আখ কত

www.pathagar.com

খেয়েছি তার হিসেব নেই। এভাবেই কাটতে থাকে সারগাছি গ্রামে আমার আশৈশব শিক্ষা জীবন।

পরক্ষণে মায়ের কথা, ছোট ভাইদের কথা, আমার গাঁয়ের কথা মনে হলে ভেতরটা মোচর দিয়ে গুমরে গুমরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তাম। মাঝে মাঝে আড়ালে, আনাচে কানাচে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতাম। কেউ যেন, টের না পায়। একদিন নানাজানের কাছে কান্না হাতে নাতে ধরাপড়ে গেলাম। তাঁর ধমকানির চোটে পেটের পিলে চমকে গেল। শুধু কি তাই? ভেতরটা ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠলো। বড় বড় চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকায় ভয়ে জড়সড় হয়ে কাঁচুমাচু হয়ে যেতাম। এরপর থেকে নানাজানকে বড্ড ভয় পেতাম। শুধু আমি কেন, বাড়ীশুদ্ধ লোকে তাঁকে বাঘের মত ভয় করতো। বাড়িতে সবাইকে সব সময় ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে শাসনে রাখতেন। তাই বাধ্য হয়ে বহুকষ্টে কান্না ত্যাগ করতে হলো। এরপর আস্তে আস্তে আমার অনেক কিছু বদলে গেল। তাঁর গুরুগম্ভীর ভাব দেখলে ভয় পেতাম। মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত যেন কত দোষ করেছি এমন অবস্থা।

স্কুলের পড়াশুনা ভালই এগিয়ে চলছে। মাদ্রাসায় শিক্ষকদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল সাতজন। তাদের কথা বলার ভঙ্গি ছিল অনেকটা সস্তা প্রশংসার মতো। বালক বয়সে শিক্ষকদের সাথে খোলামেলা মনোভাবের অবকাশ ছিল না আমার। স্কুলে কোন সময় ভয়শূন্য হতে পাড়তাম না। তাদের কাছে যেতে ভয় পেতাম। মুখোমুখি হতেও সাহস হতো না। কঞ্চির ছড়ি হাতে শিক্ষকেরা ক্লাসে প্রবেশ করলে ছাত্রদের আক্কেলগুম হয়ে হৃৎকম্পন শুরু হয়ে যেত।

সকল শিক্ষকদের মধ্যে করিম মাস্টার ছিলেন খুব রাগী মানুষ। ক্লাসে কোন ছাত্র পড়া না পারলে আর এক ছাত্রকে বলতেন মাথামোটা বাঁদরটাকে ধরে নিয়ে আয়। তাকে ভয়ে ভয়ে হাজির করা হলে কঞ্চির ছড়ি দিয়ে নির্বিচারে বেধরক মারতেন। অনেক সময় প্রহারে ছাত্রকে ধরাশায়ী করে দিতেন। প্রহারের সময় ছাত্র প্রথমে অ্যা-অ্যা-অ্যা। তারপর হাত পা ছুড়ে বাবাগো মাগো বলে গলা ফাটিয়ে কাঁদতে থাকতো। প্রহৃত

www.pathagar.com

ছাত্র করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তাঁর হৃদয় বিগলিত হতো না। এতো নির্দয় ছিলেন তিনি। এমন দৃশ্য ভুলা যায় না। ক্লাসের ছাত্ররা ফ্যালফ্যাল করে স্যারের দিকে তাকিয়ে থাকতো। আহা বলারও সাহস ছিল না কারো। সকলে মুখবুজে থাকতো। তাঁর ভেতরটা যেন পাথরের মত শক্ত। প্রহারে তিনি মনের সাধ পূর্ণ করে নিতেন। অবস্থাটা এমন, তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে পুলিশে চাকরি নিলে তাঁর প্রহারের চোটে দেশজুড়ে কোন চোর থাকতো না।

ছাত্রদের না ভালোবাসলে তাদের মাঝেও ভালোবাসা যে কাজ করে না এই সত্যটা সে যুগের অনেক শিক্ষকেরা বুঝার চেষ্টা করতেন না। ভয়ে কি আর ভালোবাসা হয়? ধমক খেয়ে কখনও ভালবাসা জন্মায় না। এ কারণে গ্রাম্য ছেলেমেয়েদের কাছে লেখপড়া শিখার কাজটা ছিল বড়ই কঠিন। গ্রামের অশিক্ষিত পরিবারে পড়ুয়া ছাত্রদের মন সব সময় শিক্ষকদের গুরুচন্ডালী ভীতিতে আচ্ছন্ন থাকতো। শিক্ষকদের লেখাপড়া শিখানোর কৌশলগত পদ্ধতিটাও ছিল অনেকটা নিপীড়নমুখী। জোর জবরদস্তি করে কাকেও বিদ্যাশিক্ষা দেয়া যায় না। তাতে ফল মন্দ বৈ ভাল হয় না বরং বিপত্তিই দেখা দেয়। এ জন্যে তারা স্কুলে যেতে ভয় পেত। গেলেও পড়াশুনায় কখনও পাঠশালার উপরে উঠতে পারতো না। লেখাপড়া শিখানোর জন্যে কিশোর ছাত্রদের মনমানস তৈরী করার কৌশল সৃষ্টি করার আগ্রহ তৎকালীন শিক্ষকদের প্রয়াসের তেমন সমর্থন মিলে না।

মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ভাল করে পড়াশুনা করছি। পড়াশুনায় নিন্দা বদনাম শুনতে হয়নি কারো কাছে। পরীক্ষায় কোনদিন কম নম্বর পেতাম না। এখন আমি পঞ্চম শ্রেণীতে। বাৎসরিক পরীক্ষার আর বেশী দেরী নেই। মনে মনে ঠিক করেছি পরীক্ষা শেষে খালাতো ভাইটাকে সাথে নিয়ে গ্রামের বাড়ী যাব। এখন শীতটাও অনেকটা কমে এসেছে। ভাইটি বয়সে আমার চেয়ে আরও আট দশ বছরের বড়। হাইস্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ে। আমাকে বড় স্নেহ করতো। প্রায় বলতো পড়ায় মন দেবে। তার কাছে কোনদিন দুষ্টুমির জন্যে পিটি খাইনি, বকাবকিও

www.pathagar.com

শুনতে হয়নি। আমাকে অতো ভালোবাসতো। ভাইটা আমার কাছে সুন্দর হয়ে ফুটে থাকতো সব সময়। বড় ভালো লাগতো আমার। তার ভেতরে বাইরে প্রকাশ ভঙ্গি ছিল একই রকম। সব সময় ঠাণ্ডা মেজাজে হাসিমুখে কথা বলতো। কখনও অন্যকে আঘাত দিয়ে কথা বলতো না। এতো সোজা সরল মানুষ ছিল। আমি দেখেছি তার আন্তরিকতায় ছিল নিজস্ব আস্থা এবং বিশ্বাস। তিনি কোন সময় কোন কিছুতে বিরোক্তও হতেন না। হঠাৎ করে এক দিন সে হারিয়ে গেল চিরকালের মতো। মানুষ মরবে কিন্তু মৃত্যুর সময় তার করুণাদ্র স্নেহময় মুখখানা দেখা হয়নি এটাই আমার জন্য চরম দুঃখ। আজও তাকে স্বপ্নের মাঝে খুঁজে বেড়াই। তার কথা মনে হলে কাঁদতে ইচ্ছে করে। সত্যিকার মানুষটা কেমন ছিল যতখানি মনে আছে সেখান থেকে মাত্র একটুখানি আমার গল্পে বলেছি। মানুষটা আজ নেই, তার অনেক কিছু আমার কাছে ঠিক তেমনি চেহারায় জেগে আছে। অনেক সময় স্বপ্নে আমার কাছে স্মৃতি হয়ে ফিরে আসে তখন আমার বুকের ভেতরটা অস্থির হয়ে ওঠে। মানসিক কষ্ট হয়। ক্লান্তি অনুভব করি। মনে মনে প্রার্থনা করি হে মহাশক্তি, হে আল্লাহ আমার ভাইটির আত্মার প্রতি করুণা কর। আমার প্রার্থনা তোমার কাছে পৌঁছে দিলাম। গ্রহণ কর।

পরীক্ষা শেষে বাড়ী যাওয়া হলো না। বিধি বিড়ম্বনা। ক'দিন না যেতেই হঠাৎ করে পিতা অসুস্থ হয়ে পড়লে আম্মা পিতাকে সাথে নিয়ে চলে এলো এখানে। ছোট ভাই দুটোও সাথে এসেছে। পিতার রোগাক্রান্ত অবস্থা দেখে আমি বড়ই বিচলিত হয়ে পড়লাম। পিতার কি হয়েছে তখনও জানতাম না। আম্মার কাছে বলতে শুনেছি পিতা সাত আট দিন একটানা ভীষণ জ্বরে ভুগেছে। গ্রামের বাড়ীতে ডাক্তার ওষুধপথ্য সবই করেছে। সেবা শুশ্রুষার অভাব হয়নি। বিষম অসুখে তিনি শ্বশুরালয়ে অন্তিম পীড়াকালে সংগাহীন হয়ে কষ্টভোগ করতে থাকেন।

গ্রাম অঞ্চলে কারো তেমন ভারী অসুখবিসুখ হলে বড় ডাক্তার জুটানো হতো কঠিন। অনেক কষ্টে দূরের এক গঞ্জ থেকে বড় ডাক্তার এনে রোগী দেখানো হলো। ডাক্তার ওষুধ দিল। ওষুধ সেবনে কিছুতেই

www.pathagar.com

কিছু হলো না। গতিক ভাল ঠেকছিল না। খারাপ লক্ষণে সবার মনে আতঙ্ক এসে গেল। দেখতে দেখতে একদিন দুদিন করতে করতে আরও কয়েকটা দিন চিন্তায় চিন্তায় কেটে গেল। কে জানতো নিয়তি তাঁকে ডেকে এনেছে শেষ পরিণতির জীবন সংহারে।

মুমূর্ষু পিতাকে যে ঘরে শুইয়ে রাখা হয়েছিল আমি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম পিতা চোখ দুটো বন্ধকরে ঠোঁটনেড়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। মনে হচ্ছে কিছু বলতে চেষ্টা করছে অথচ কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। আকুল চিত্তে আমিও নিরতিশয় মনের যাতনায় ছটফট করতে থাকি।

আম্মা কাছে বসে বুঝেছে অবস্থা বড়ই খারাপ। নীল চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে ধ্বংসের অবশিষ্ট সময়টুকু। দেখছে নীরব হতাশ চোখে। আম্মা বুঝেছে সংসারের প্রদীপ নিভতে আর বেশী দেরী নেই। মৃত্যু ঘটবে এখুনি লক্ষণ স্পষ্ট। বুকটা উঠছে আর পড়ছে। সকলেই বুঝলো এখন শেষ সময়। অশ্রুপ্লাবিত নয়নজলে আম্মার শাড়ীর আঁচল ভিজে গেছে। আম্মা তার ডান হাতটা পিতার মাথায় রেখে আর এক হাতে আমাকে ইশরায় ডেকে কাছে বসিয়ে মাথায় হাত বুলাতে থাকে। ছোট ভাই দুটো পাশের ঘর থেকে ধীর পায়ে এসে মায়ের কোল ঘেঁষে বসে মুমূর্ষু পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল বড়ই করুণ চোখে। গৃহদ্বারে যারা দাঁড়িয়ে ছিল কেউ কথা বলছে না। সকলেই চুপচাপ। শয্যাপাশে কেউ কেউ কালেমা শাহাদত পড়ছে। তিনি বিহবল চিত্তে অশ্রুঝড়া নয়নে পিতার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাঁপাকাঁপা কণ্ঠে আল্লাহকে ডাকছে এবং গভীর মমতায় আস্তে আস্তে কপালের সিক্তঘাম মুছে দিচ্ছে। আম্মার শরীরটা তখন ডানাভাঙ্গা পাখীর মত থরথর করে কাঁপছে। নিজের ভার নিজে ধরে রাখতে পারছে না।

রাত এলো। মসজিদে এশার নামাজের আজান ধ্বনিত হলো। মুসুল্লিরা অজু করে নামাজের জন্যে তৈরী হচ্ছে। মোয়াজ্জিনের আজান শেষ হলো। আজান শেষে পিতাকে মোটেই ভাল বোধ হচ্ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যে হাত পা অসার হয়ে এলো। দেখতে দেখতে সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে আম্মা ব্যাকুল হয়ে পড়লো। দেহের তাপ কমে এলো। মুহূর্তে একটু জ্ঞান ফিরে এলে আব্বা অর্ধনোমিলিত

www.pathagar.com

নয়নে শেষ বারের মত আম্মার মুখখানা দেখতে দেখতে চোখদুটো জন্মের মত বন্ধ করলেন। জীবনের সকল লেনদেন চিরতরে শেষ হয়ে গেল। তাঁর প্রাণ প্রদীপ নিভে গেল। জীর্ণ দেহটা নিথর হয়ে গেল। রুহ মোবারক বেহেশত লোকে গমন করলো। অনেকে ব্যথার সুরে কেঁদে উঠলো।

একে একে গাঁয়ের মানুষজন এসে ভীড় জমিয়েছে। কেউ কেউ পিতার মুখটা একবার দেখে নেয়। অনেকে মুখ ফিরিয়ে অশ্রু মোছে। কয়েক জন ব্যথিত চিত্তে ঘরের বারান্দায় ধীরস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আম্মা জল ছলছল নয়নে এক দৃশ্যে পিতার মরদেহের দিকে তাকিয়ে হাতের রেশমী চুড়িগুলো মর্‌মর্‌ করে ভেঙ্গে বৈধব্য বেশ ধারণ করলো। স্নেহের সন্তানদের কোলে জড়িয়ে ধরে আম্মা আহাজারি আর্তনাদে ভেঙ্গে পড়লো। পিতাকে হারিয়ে আমিও কান্নায় হাহাকার করতে লাগলাম। কান্নার সাথে বলতে থাকি কী হলো, এ কী হলো? তখন বেদনার হাহাকারে আমার ভেতরটা যেন ফেটে পড়লো। ছোট ভাই দুটো পিতার মরদেহের পাশে বসে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। ভাই দুটো ছোট। তারা কী সম্পদ হারালো তা বুঝার বয়স তখনও তাদের হয়নি। স্নেহের সন্তানদের কাছে নিয়ে আম্মা বিরামহীন কাঁদছে। নিজের জ্ঞানটুকু ধরে রাখতে পারছে না। তখন আম্মার কাছে কোন সান্ত্বনা কাজে লাগছে না।

পিতার মৃত্যুদৃশ্য চোখে দেখলাম। এর আগে কাউকে মরতে দেখিনি। মনে হচ্ছিল তবে এই কি মৃত্যু! দেখলাম মৃত্যু জিনিষটা কত ভীষণ, কত নিষ্ঠুর এবং কত কষ্টের। মুহূর্তে আমার কাছে সব হারিয়ে গেল। তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। এসে গেল আমাদের শৈশব জীবনের দুর্ভাগ্য। গর্বের পিতার, পরম স্নেহের পিতার প্রাণহীন মুখখানা নয়ন ভরে বারবার দেখতে থাকি।

আমার কান্না শুনে পেছন থেকে কোন এক পর্শি বলে উঠলো, কেঁদো না বাবা। পেছনে একবার তাকিয়ে নিজের চোখ দুটো মুছলাম। অসহ্য হৃদয় যন্ত্রণায় কান্না সংবরণ করতে পারিনি।

নানীজান একটা পরিষ্কার ধপ্‌ধপে্ সাদা চাদর দিয়ে পিতার মরদেহটা আবৃত করে দিল। ঘরের ছাঁচ বারান্দার পাশ থেকে শিউলি

www.pathagar.com

ফুলের একরাশ সুগন্ধি বাতাসে মৃত পিতার ঘরটা ভরে গেল।

রাত্রি গভীর হতে থাকায় বাড়ীর ভেতরটা আস্তে আস্তে নীরব হয়ে এলো। অতঃপর যে যার বাড়ীর পথ ধরলো। কান্নাকাটিও অনেকটা থেমে এলো। রাত্রি শেষে প্রভাত এলো। প্রভাত কেটে বেলা বাড়ছে। কাফন দাফনের সকল আয়োজন সমাপ্ত হলো। নানাজী ও মামুজী দুজনে মিলে দাফনের কাজ শুরু করে দিলেন। পিতার মরদেহ গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে দিল। খাটিয়াটি এনে রাখা হলো মসজিদ প্রাঙ্গণে। জুম্মার নামাজ শেষে সকল মুসুল্লিরা জানাজায় শরিক হলেন। সারগাছি গ্রামের শালবাগানে পিতাকে কবর দেওয়া হলো। একজন একজন করে একমুঠো মাটি রেখে দিল কবরের বুকে। মাটি হাতে আমার হাত কাঁপে। অনেক কষ্টে তিনমুটো মাটি রেখে দিলাম পিতার কবরে।

স্নেহের পিতাকে কবরে রেখে বাড়ী ফিরছি। তখন আমার শোকের কষ্টটা আরো বেড়ে উঠলো। পিছনে ফিরে ফিরে পিতার কবরটা বারবার দেখি আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি। তখন ভেতরের দুঃখ বেদনার ভার বইতে পারছিলাম না। একথা কাউকে বলিনি। পা দুটো সামনের দিকে এগোচ্ছে না। হৃদয়ে অনুভব করতে থাকি এমন মর্মান্তিক বেদনা সইব কেমন করে?

পিতার মৃত্যুগ্রাস দৃশ্য মর্মবেদনায় কত যে কষ্টদায়ক তা আজও ভুলিনি। ভুলতেও পারবো না। এই নির্মম মৃত্যু দৃশ্য আমার স্মৃতিজগৎ থেকে বিস্মৃত হবে না কোন দিন। অশ্রুঝরা এই করুণ দৃশ্য আমার শৈশব স্মৃতির মাঝে এক দুর্বিসহ কঠিন আঘাতে ভেতরটা ক্ষতবিক্ষত করে রেখেছে। সেই নিষ্ঠুর অতীতকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারবো না কস্মিনকালেও। পিতার মরদেহ সারগাছি গ্রামের শালবাগানে ধূলোমাটির গোরে বিলীন হয়ে আছে। আমার হৃদয় বেদনার নিদারুন সূরে আর্তনাদ করে ওঠে। আজও সেই স্মৃতির যাতনা থেকে মুক্তি পাইনি। পিতা হারানো অমূল্য স্মৃতিটা শৈশব কাল থেকে আগলে রেখেছি দুঃখ বেদনার সম্পদ হিসেবে।

www.pathagar.com

বিত্তনেশায় সোনার হরিণ

বদলি চাকরি। মাত্র কয়েক মাস হল মিজান সাহেব বদলি হয়ে নারায়নগঞ্জ থেকে সাভারে নতুন এসেছেন। সাভার একটা ছিমছাম উপজেলা শহর। খুব ছোট্ট শহর। এখানে থানা, পোস্ট অফিস, ব্যাংক, রেজিষ্ট্রি অফিস, পৌরসভা অফিস, তিনটে হাসপাতাল সহ সবই নাগালের মধ্যে। এখানে আছে বালক বালিকাদের জন্য পৃথক পৃথক চারটে উচ্চ বিদ্যালয়, একটি ফাজিল সিনিয়র মাদ্রাসা, একটা বেসরকারী মহিলা কলেজসহ মোট তিনটে কলেজ এবং একটা মেডিকেল কলেজও আছে এই সাভারে। এর মধ্যে সাভার কলেজের নাম ডাক বেশী। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধ এখানে অবিস্থত হওয়ায় বিশ্বের বুকে সাভার একটা আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দেশ বিদেশের সহস্র সহস্র জ্ঞান বিদ্যার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যাপীঠটিকে সব সময় আনন্দ মুখর করে রেখেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণটি প্রাকৃতিক শোভায় সব সময় রাণী সেজে আছে। অপূর্ব সৌন্দর্যে ভরা সারা এলাকা জুড়ে। রক্তপলাশ, কৃষ্ণচূড়া, দেবদারু এবং আম কাঁঠালের সারিসারি বৃক্ষরাজি মাথায় মাথায় এক হয়ে আছে। বসন্তকালে গাছেগাছে কোকিল ডাকে, দোয়েল শীষ দেয়, বউ কথা প্রভৃতি গায়ক পাখিরা গাছের ডালে ডালে ডেকে বেড়ায়। আবার চতুর্দিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে লেকের পর লেক। স্বচ্ছ পানি টলমল করছে লেকের ঢেউ খেলানো তরঙ্গে তরঙ্গে। দেখতে বড়ই সুন্দর। বন হাঁসের ঝাঁক দলবেঁধে লেকের পানিতে কেলি করে চড়ে বেড়াচ্ছে মনের আনন্দে। ওরা কোন সময় অন্যত্র উড়ে যায় না। ঘনছায়া ঘেরা পরন্ত বিকেলে বিদ্যালয়ের তরুণ তরুণীরা লেকের পাড়ে সবুজ ঘাসের উপর বসে যৌবন রসে সিক্ত হয়ে গল্পে গল্পে সময় কাটায়। তখন তারা প্রকৃতিকে নিয়ে ডুবে থাকে সৌন্দর্য স্নানে।

সাভারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একবার চোখে দেখলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন এর সাথে জড়িয়ে আছে। সাদৃশ্যে বেশ মিল। পুরো জায়গা জুড়ে এর সাথে ওর একটা আকর্ষণ আছে।

www.pathagar.com

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একবার এলে বারবার আসতে ইচ্ছে করে। কতবার আসতে মন চায়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মনে হয় এ যেন অন্য কোন এক ভূবন। রবীন্দ্রনাথ বোলপুরকে স্থান নির্বাচন করতে যেমন ভুল করেননি তেমনি জাহাঙ্গীরনগরের জন্য সাভারকে স্থান নির্বাচনে আছে সঠিক সিদ্ধান্ত।

ইতিমধ্যে সাভারের পথঘাট দোকানপাট সবই মিজান সাহেবের জানা হয়ে গেছে। কিছু কিছু গণ্যমান্য লোকের সাথেও সৌহার্দ সুলভ পরিচয় করে নিয়েছেন বেশ অল্প সময়ের মধ্যে। তার প্রথম পরিচয় সাভার অধর চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের সাথে। তিনি বেশ অমায়িক আলাপী মানুষ। পরে তিনি মিজান সাহেবকে বড় ভাই বলে ডাকতেন। মিজান সাহেব তাঁর চেয়ে বয়সে ছিলেন বড়। হয়তো একারণে তিনি মিজান সাহেবকে বড় ভাই হিসেবে বেছে নিয়ে ছিলেন। আবার ক'দিন না যেতে সাভার কলেজের এক প্রফেসার সাহবের সাথে নতুন করে মিশে গেলেন তিনি। সাভার বাজার রোডে তার একটা ব্যবসায়ী দোকান ছিল। প্রত্যেক দিন বিকেলে তিনি এই দোকানে আসতেন। অফিস থেকে ফেরার পথে প্রায় তাঁর দোকানে এক কাপ চা না খাইয়ে প্রফেসার সাহেব মিজান সাহেবকে ছাড়তেন না। এভাবে তিনি আরও কাছের ও মনের মানুষ হয়ে গেলেন। বাসায় দুএকবার দাওয়াত দিয়েও খাইয়েছেন সুন্দর রুচির ছিমছাম পরিবেশ।

মিজান সাহেব ছিলেন একজন নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ কেবল অফিস আর বাড়ী এবং বাড়ী আর অফিস। তাঁর জীবনে শখ-টক বলতে তেমন কিছু আগেও ছিলনা আজও নেই। মৃদু রসিকতার ছলে তিনি একদিন বললেন জীবনটাকে যারা আশার নিশায় ভরাতে চায় কেবল তারাই শখের স্বপ্ন দেখে। আমি শখের স্বপ্ন দেখিনা। দেখতে সাহসও পাই না।

মিজান সাহেব বদলি হয়ে সাভারে এসে এখান থেকে তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন টাঙ্গাইল জেলার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ছেলের সাথে। ছেলেটি উচ্চ শিক্ষিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম পাশ। প্রথম দিকে ছেলেটি সাভার কলেজে কয়েকটা বছর শিক্ষকতা করেছিল। পরে শিক্ষকতা ত্যাগ করে একটা সরকারি অফিসে সিনিয়র অফিসার পদে

www.pathagar.com

চাকরি নেয়। হেড অফিসে পোস্টিং, সপরিবারে ঢাকায় থাকে। তাদের এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ে বড়। ছেলেমেয়ে দুজনেই পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী। সংসারে আর্থিক স্বচ্ছন্দ তেমন একটা না থাকলেও সাদামাটা অবস্থায় তাদের দিন চলে।

মিজান সাহেবের ছেলে ইকবাল হাসান সরকারি শিক্ষা বিভাগে অফিসার পদে চাকরি। সে বড় নীতিবান এবং চিরদিনই নীতি প্রসন্ন। বাড়তি টাকা রোজগারের কু-কাজটা সে সব সময় ঘেন্নার চোখে দেখে। চাকরিতে উপরি আয় মোটেই পছন্দ করে না। এতে তার বিন্দুমাত্র দুঃখ আফসোস নেই। অফিসে ঘুষ খাওয়ার অনেক সুযোগ থাকলেও এই খারাপ কাজটাকে সে সব চাইতে বেশী ঘৃণ্য কাজ মনে করে। কষ্ট করে সংসার চালাবে তবুও হারাম অর্থ উপার্জন করবে না। এই ব্রতই তার অনমনীয় আদর্শ। এই পদে যারাই চাকরি করেছে তাদের অনেকেই বেশকিছু টাকা পয়সার মালিক হয়ে গেছে। দৈ-মিষ্টির হাঁড়ি, বড় বড় রুইকাতলা মাছ, খামের ভেতর টাকার বান্ডিল সবই যেন মেঘ না আসতে বৃষ্টির মত। তারা এটাকে ঘুঁষ না বলে নামকরণ করেছে উপহার অথবা নজরানার ন্যায্য প্রাপ্য। চরিত্র বজায় রেখে অর্থ উপার্জন করতে তেমন কেউ না চাইলেও মিজান সাহেবের ছেলে তা চায়।

ইকবাল স্বভাবে ন্যায়বাদী বলে সে সব সময় পিতার নীতি অনুসরণ করে চলে। উর্দু বায়াতে বলে বাপকা বেটা আওর সেপাহিকা ঘোড়া কুছ ভি নেহি হো তভ্ভি থোরা থোরা। তাই পিতার বৈশিষ্ট্যের হাওয়া সন্তানের গায়েও ছোঁয়া লেগেছে। নামীদামী ঠাটবাট সবই ছিল তার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত লিপ্সা। মানমর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে সে যেমন রাজি নয় তেমনি কারো কাছে ঘৃণার পাত্র হতেও চায় না সে। মর্যাদাধীকারী হয়ে চাকরি করাটা সে সব সময় গর্ববোধ করে। ঘুঁষের টাকায় সে অমর্যাদাকর পঙ্কে নিমজ্জিত হতে মোটেই রাজী নয়। চাঁড়াল হয়ে চাঁদে হাত বাড়াবার মনোবৃত্তি তার কোন দিনই ছিল না। সে পিতামাতার এক হাঁড়িতে একান্ন পরিবারের সন্তান। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সব কিছুতে খাপ খাইয়ে চলাটা তার বাস্তব নীতি।

একদিন ইকবালের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হলো। বিয়ের সকল আয়োজন চূড়ান্ত করে দিন তারিখও ধার্য হলো। মিজান সাহেব ছেলের

www.pathagar.com

বিয়ে করিয়ে দিলেন এক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে। বিয়ের আর্থিক খরচের নড়বড়ে অবস্থা মিজান সাহেবকে বেশ শিহরণ জাগিয়ে ছিল কেবল তাঁর অস্বচ্ছলতার কারণে। যদিও তিনি বেশ হিসাবি মানুষ তবুও খরচে কুলাতে পারতেন না। ব্যাংকে তাঁর তেমন কোন জমানো টাকা নেই। যেভাবেই হোক তাঁকে নতুন করে অনেক কিছু কেনাকাটা করতে হয়েছে।

ছেলের গায়ে হলুদের আনন্দঘন সময়ে মিজান সাহেবের মায়ের কথা বারবার মনে হতে থাকে। মা বেঁচে নেই। থাকলে কতই না খুশি হতেন তাঁর ছেলের প্রথম সন্তানের বিয়েতে। প্রাণ ঢেলে, মন ভরে কত দোয়াই না করতেন আল্লাহর কাছে তার সন্তানের জন্যে। তখন প্রয়াত মায়ের অগুণতি স্মৃতি মিজান সাহেবের দুর্বল হৃদয়কে নাড়া দিতে থাকে। স্মৃতির গভীরে বেদনার যাতনায় সেদিন তিনি কাঁদতে পারেননি। তখন কাঁদবারও সময় নয়।

আবেগ ভরা কণ্ঠে মিজান সাহেব তখন বলতে থাকেন, এই শুভ ক্ষণে ছেলের মনের মাঝে তার স্বর্গীয় দাদীর স্মৃতি জেগে উঠে ছিল কি জানি না। স্নেহের সন্তানটি ছিল পরম দাদী ভক্ত। ভক্তি না থাকলে ভক্ত হওয়া যায় না। এটা সবাই বোঝেন ভক্তি জিনিষটা মানুষের সহজাত বোধ থেকেই জন্ম নেয়। গুরুজনদের কাছে ভক্তির মূল্যবোধ একটা চমৎকার বিষয়। ইকবালের কাছে এই শক্তি তার আত্মনিয়ন্ত্রণ হিসেবে কাজ করেছে তার ছোটবেলা থেকে।

শৈশবে সে তার দাদীর কাছে কোরআন শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ লাভ করেছে। তার দাদীই ছিল গৃহে কোরআন শিক্ষার শিক্ষাগুরু। দাদীর কাছে থেকে ভালো ভালো কথা শিখেছে, ভালো ভালো উপদেশ পেয়েছে। এগুলো সবই তার মনের গোড়ায় উর্বরতা জুগিয়েছে। এভাবেই সে তার দাদীর কাছে পেয়েছে অনেক আশীর্বাদ। এটাই ইকবালের জীবনে বড় পুরস্কার। শৈশবে দাদীর শাসন নীতি তাকে শিখিয়েছে জীবনের সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি।

সন্ধ্যায় ইকবালের গায়ে হলুদের শুভ লগ্নের সময় হয়ে এলো। মেয়ের বাড়ী থেকে ছেলের জন্য পাজামা, পাঞ্জাবী, তোয়ালে, সেন্ডেল

www.pathagar.com

এবং কয়েক প্রকার বিলাস দ্রব্য, গায়ে রং দিয়ে নক্‌শা করা নতুন মাটির হাঁড়িতে এক হাঁড়ি মিষ্টি ডালি সাজিয়ে নিয়ে এলো মেয়ের বাড়ীর লোকেরা।

সন্ধ্যার লম্বা ছায়া ছড়িয়ে পড়তে শুরু হলো চারদিকে। মাগরিবের নামাজের পর শীতের আবহাওয়ায় মিজান সাহেবের ছেলের গায়ে এক মুঠো হলুদ ছুরলো মিষ্টি আমেজ সন্ধ্যায়। বাড়ীর ভেতরটা জমজমাট। হৈচৈ আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে গায়ে হলুদ পর্ব সমাপ্ত হলে একটা ধারাবাহিক ব্যবস্থায় চা নাস্তার আসর বসলো তাদের ড্রয়িং রুমে। নানা রকম খাবার দিয়ে সাজানো ছিল ঘরের টেবিলটা। অনাড়ম্বর পরিবেশে হাসিখুশি, ঠাট্টা তামাশা, এবং খোশগল্পে ওদের সময়টা ভালই কাটলো। এরপর ক্রমে রাত গাঢ় হয়ে এলে বাড়ীর ভেতরটা আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এলো।

পরের দিন ইকবাল বিয়ে করে ঘরে নতুন বউ আনলো। নতুন কনে হয়ে মেয়েটি বাড়ীর বড় বউ হয়ে শ্বশুর বাড়ীতে প্রথম পা রাখলে মিজান সাহেব ভেবে ছিলেন তাঁর একমাত্র আদরের কন্যাকে বিয়ে দিয়ে আর এক বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন সুবাদে তাঁর কন্যার শূন্য স্থানটি পূরণ করে নেবে ছেলের নবপত্নী। কিন্তু মাস না যেতে মিজান সাহেব বুঝতে পারলেন ছেলের নবপত্নী মানস স্বভাবে তেমনটি হতে পারেনি হয় তো কিছুটা আদর্শিক গুণের অভাবে।

মিজান সাহেবের নব পুত্রবধুকে তার বাপের বাড়ীর লোকেরা পারু বলে ডাকতো। এটাই ছিল পারুর ডাক নাম। পরে তিনি লক্ষ্য করলেন পারু স্বভাবে ছিল বড় জেদী মেয়ে। মিজান সাহেব বয়সের অভিজ্ঞতায় এটা ভালই বোঝেন, মেয়েদের জন্যে বেশী জেদ ভাল নয়। এতে মন্দ বৈ ভাল হয় না। অনেক সময় এতে সৃষ্টি হয় অশান্তি। লোভ, ক্রোধ এবং জেদ মানুষকে কেবল ধ্বংসের পথ দেখায়। মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা জানে এর পরিণতিটা কি।

বিয়ের পর পারু তার স্বামীর চাকরির বেতনের ওপর নির্ভরশীল হতে পারলো না। স্বামীর অল্প আয়ে চলতে চায় না সে। সব সময় তার

www.pathagar.com

অনেক টাকার লম্বা খায়েশ। প্রচুর টাকায় তার লোভ এসে গেল। তার কেবল বিদেশী অর্থের চিন্তা। অর্থমগ্নতা এবং ভোগ বিলাসের মায়া ক্রমেই তাকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। লোভ জিনিষটা বড় মারাত্মক এটা সে বুঝলোনা। অর্থচিন্তা তাকে সব সময় কামড়াতে থাকে। লোভের চ্যাটচেটে গাঢ় রস তাকে সেঁটে ধরলো। অর্থের নেশায় সে বুদবুদ হয়ে পড়লো। মাথায় ভূত চাপার মত বৈভব নেশা জোড়েসোড়ে তার ওপর জেঁকে বসলো। এরপর নানা ফন্দি ফিকির করে একটা উপায় বের করলো সে। কোন চিন্তা ভাবনা না করে নয়ছয় করতে করতে সোনার হরিণ পাওয়ার আশায় তারা বিদেশ যাত্রার লোভ সামলাতে পারলো না। এরপর দেশের মায়া ছিন্ন করে একদিন তারা সপরিবারে পাততাড়ি গুটিয়ে উড়াল দিল এক রাজকীয় দেশে।

তাঁর কষ্টের গচ্ছিত যা কিছু খুদকুঁড়ো ছিল নিজের মনের বিরোধীতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাও ছেলের হাতে তুলে দিতে হলো তাদের বিদেশ যাত্রার রাস্তা খরচ হিসেবে। যাবার সকল প্রস্তুতি ঠিক হলে ইকবাল তার লৌহ খুঁটিসম সরকারি চাকরি ছেড়ে একদিন জিয়া বিমান বন্দরে সবাই মিলে উড়োজাহাজে চড়ে দেশ ছাড়লো ধনী হওয়ার স্বপ্ন লালসায়। অনেক লোভে লাভ নেই এটা তারা বুঝলো না।

তাদের দেশ ত্যাগের পর মিজান সাহেব আক্ষেপ অনুশোচনা নিয়ে আমাকে কতকগুলো কথা বললেন। তিনি একটা হাইতুলে বললেন, প্রবাসী জীবন সম্বন্ধে ভালোমন্দ অনেক কথাই তো শোনা যায়। আমারও ভয় হয় তাদের প্রবাস জীবন নিয়ে। কারণ ওদেশে তাদের কর্ম পদ্ধতি তাদেরই ঠিক করে নিতে হবে। হয়তো অনেক দিন তাদের সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণতে হবে। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌছানোর জন্যে অনেক দিন অপেক্ষায় থাকতে হবে। তখন তাদের দরকার সাহস এবং ধৈর্য। সেই সাথে পাশ্চাত্যের বেশভূষা, ভাষা, রীতি রেওয়াজ এবং ঐ দেশের সংস্কৃতির সাথে তাদের চালচলনে অভ্যাস্ত হয়ে মিশতে হবে। এমনকি নিজ ধর্মকে মূলধারা থেকে হয়তো কিছুটা বিস্মৃতি ঘটাতে হবে। শিরদাঁড়া সোজা করে থাকতে পারলে জীবন সংগ্রামে জীবনকে সুখময় করে বাঁচতে

www.pathagar.com

পারবে।

মিজান সাহেব এটুকু ভালই বোঝেন বেকার এশিয়ানরা পাশ্চাত্য দেশে গেলে সব সময় নিম্নমানের কাজ করে অর্থ কামায়। যতই বিদ্যাবুদ্ধি থাকুক প্রথম অবস্থায় তাদের ফ্যাঁফ্যাঁ করে ঘুরে বেড়াতে হয় একটা কাজের জন্য। ভাবনাটা ওখানে যদি ঠিকমত কিছু করতে না পারে কিংবা পরে বার্ধক্যের সমস্যা দেখা দিলে তখন ওরা কি করবে? কথায় বলে হেরেছ তো ডুবেছ। জিতেছ তো বিত্তের মুকুট মাথায় দিয়ে দেশে ফিরেছ। মিজান সাহেব আজও তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তেমন কিছুই বলতে পারেন না। কারণ আজ তারা নিজ দেশ থেকে অনেক দূরে। সব কিছুই মিজান সাহেবের কাছে আজানা, তাই।

বাস্তবতার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বলতে হয় পারুর দম্ভ অহংকার মিজান সাহেবের কাছে তেমননজরে পড়েনি। সব সময় সে হাসিতে খুশিতে এবং গল্পেগুজবে সরগরম করে রাখতো মিজান সাহেবের বাড়ীর অন্দর মহল। তার বাচন ভঙ্গি ছিল বেশ সুন্দর যার জন্য সে অনর্গল কথা বলার অভ্যাসে নিজেকে মার্জিত রাখতো। তার আচরণ ছিল অনেকটা পরিমার্জিত।

পারু আগে থেকেই হয়তো বুঝেছিল তার একটা মেয়ে হয়েছে, তাকে বিদ্যাশিক্ষায় শিক্ষিত করে উপযুক্ত করতে হবে। একদিন উপযুক্ত পাত্রের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তখন ধুমধামের বিয়েতে অনেক টাকার দরকার হবে। এখন থেকে তাদের মেয়েকে সেই ভাবে তৈরী করা দরকার। মিজান সাহেব প্রায় বলতেন, "মহান আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি তাদের প্রথম প্রভাত যেন সুখের জোয়ার বয়ে আনে ওদের সবার জীবনে"।

পারু তার সরল সোজা স্বামীটাকে প্রলুব্ধ করে পতি কন্যাদের সাথে নিয়ে দেশান্তর হলো সুখের আশায়। ধনী হওয়ার স্বপ্ন মনের মাঝে পুষে তারা মনটাকে লোভাতুর করে তোলে। তারা বড় লোকের দেশে যাবে। সেখানে তারা দুহাতে দেদার টাকা কুড়িয়ে ঐশ্বর্যশালী হবে। মিজান সাহেব বুঝলেন তাদের আত্মতুষ্টির মোহনিদ্রা হয়তো একদিন ভাংবে যেদিন তিনি তাদের কাছে শোকগাথা হয়ে থাকবে ওদের হৃদয় জুড়ে।

www.pathagar.com

পারু বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রীধারী হয়েও বুঝলো না অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ভোগান্তি জীবন থেকে কোন দিন দূর হয় না।

ইকবাল সপরিবারের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় মিজান সাহেবের মনটা বিষণ্নতার আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়ে। তাদের বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে তিনি মুখে কিছু না বললেও মনের ভেতরটা চরম বিদ্রোহ করে বসে। তখন তার ভেতরটা হাহাকারে ভরে ওঠে। অনেক সময় তিনি নিজেকে গুমরে রাখেন। কারো সাথে তেমন কথা বলেন না। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে উত্তরে বলতেন, না, কিছুনা। স্ত্রী স্বামীকে বোঝায় এমন করে থাকলে শরীর ভেঙ্গে যাবে। তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় হাতের সংবাদ পত্রের পাতায় চোখ রাখলেন। কিছু বললেন না।

তিনি একটু চুপ থেকে স্ত্রীকে কাছে বসিয়ে বললেন, দেখ, মাঝে মাঝে মনে হয় তবে কি আমার জীবনটা সবার কাছে আগাছার মতো মূল্যহীন হয়ে পড়লো? আবেগ ভরা কণ্ঠে মিজান সাহেব স্ত্রীকে বললেন, দেখ, তুমিও তো জানো জীবনপাত পরিশ্রম করে আদরের ছেলেমেয়েদের শৈশবে লালন পালন করেছি। তারা হাঁটতে জানতো না হাঁটতে শিখিয়েছি। তাদের লেখপড়া শিখিয়েছি। ছেলেকে আদর যত্ন দিয়ে এবং কষ্টের অর্থ ব্যয় করে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করেছি। শিখিয়েছি দেশজ আচার, রীতিনীতি, সভ্যতার মূল্যবোধ। এ কারণে ছেলে একটা রিক্সা চালককেও আপনি বলে সম্বোধন করে সম্মান দিতে শিখেছে। জীবনে উল্টোপাল্টা আজও সে শেখেনি।

মিজান সাহেব অশ্রুসিক্ত নয়নে স্ত্রীর হাতটা চেপে ধরে পুনরায় বললেন, বসো, আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন। আজ আমার বার্ধক্যের অমোঘ ক্লান্তির চাপে জীবনীশক্তি ক্রমে ক্ষীণ হয়ে শূন্যের ঘরে চলে গেছে। হৃদয়ের মর্মস্থল বড়ই দুর্বল। একমাত্র আল্লাহর সাহায্য নিয়ে বেঁচে আছি। জীবনের মমত্ববোধ বাঁচার জন্য আমাকে আর প্রভাবিত করে না। জীবনে বর্তমান ভবিষ্যৎ বলতে কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার বেঁচে থাকার লক্ষ্যে এনে দিয়েছে তিক্ততা। নামে মাত্র দুটো দানাপানি যোগানোর কষ্ট নিয়ে তুমি আমি দুজনেই বেঁচে আছি জীবন সমাপ্তির জন্যে। বলো, সত্য কিনা?

www.pathagar.com

উত্তরে স্ত্রী বললো- ঠিক বলছো। তবে আমিও একটা কথা বলি শুনবে?

- বলো, কি বলতে চাও।

- দেখ, ভাগ্যকে কেউ বিশ্বাস করুক না করুক।' আমি করি। ভাগ্যের সাথে অনেক লড়াই করলে। ফল কি হলো? এর কার্যকরিতার ফল কি পেলে?

প্রত্যেক মানুষ তার সাধ্য অনুযায়ী ভাগ্য ফেরাতে চেষ্টা করে। তুমিও কম করোনি। শেষ পর্যন্ত কিছুই পাওনি। এটা তুমিও বুঝেছ, আমিও দেখলাম। ভাগ্যের চাবিকাঠি হাতে থাকলে নিশ্চয় সব খুলে যেত। এনিয়ে মিছামিছি ভেবো না। সমৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। যেমন আছো থাকো- সামনের দিনগুলো একভাবে কেটে যাবে। অতো ভেবে কি হবে? তারা নিজের ভালোর জন্য গেছে। তুমি কি তাদের ভালো চাও না?

সোজাসুজি স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে মিজান সাহেব বললেন, হ্যাঁ চাই। এছাড়া ওদের কি অন্য কোন পথ ছিল না? ছেলে বেকার নয়। সরকারি অফিসে ভালো চাকরি করতো। এই চাকরিতেই তার ভাগ্য ফুলে কলাগাছ হতো। তার একটা তর সইলো না।

স্ত্রী নূরজাহান এবার একটু চুপ থেকে মৃদুকণ্ঠে বললো, সবই ঠিক আছে। তারা যা ভালো বুঝেছে তাই করেছে। তুমি এ নিয়ে অতো ভেঙ্গে পড় না। এরকম হলে কোন কাজে তোমার মন বসবে না। তুমিতো বুঝদার।

নিজেকে বিপন্ন না করে আত্মবিশ্বাসে শক্ত থাকো। অতো মুষড়ে পড়ো না।

এবার তিনি স্ত্রীকে শ্রদ্ধার নজরে দেখে বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলছ,, নাহক ব্যাপারে অতো চিন্তা ভালো না। ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। মনে জোর না আনলে আমারই ক্ষতি হবে।

বেগবতী নদী যেমন বয়ে চলে সাগরে মিশার জন্যে তেমনি মিজান সাহেবের আয়ু জীবন থেকে সরতে সরতে মৃত্যুর দিকে বয়ে চলেছে অবিচ্ছন্ন ধারায়। আজ তিনি দৈন্যদশায় বড় একা। বাকী জীবনটা হয়তো অসহায় অবস্থায় কেটে যাবে এবং মৃত্যুই তাঁর মুক্তির পথ এনে দেবে শীঘ্র।

www.pathagar.com

মিজান সাহেবের বাঁচার সখ আর নেই। তিনি যাদের নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন পরিশেষে তারাই যখন তাকে একা রেখে দেশ ছাড়লো তখন থেকে সোনার পৃথিবীটা তার কাছে অনুপ্রেরণাহীন হয়ে পড়ে। এখন তার জীবনটা বেদনার স্রোতে ভেসে চলেছে শেষ পরিণতির ঠিকানায়। তিনি মনে মনে আর একবার ভেবে বললেন স্ত্রী ঠিকই তো বলেছে। তবে কি আমি বিচারবুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছি।

মিজান সাহেবের একমাত্র খেলার সাথি ছিল তার ছোট্ট পুতনী। মেয়ের জন্মের পর তার বাবামা শখ করে নাম নির্বাচন করলো সেতু। নামের উচ্চারণটা কত সহজ। কী সুন্দর ফুটফুটে রং চেহারা এবং কচি কোমল মুখের মিষ্টি হাসি। চোখ ভুলানো দুধে আলতায় গায়ের রং, দেখলে সবাই তাকে আদর করে বলতো বিদেশিনি। সবেমাত্র আধোআধো বুলি নিয়ে কথা ফুটেছে। মুখে ফুটেছে জ্যোৎস্না হাসি। মুক্তাঝড়া স্নিগ্ধ হাসি নেমে আসতো তার ঠোঁটের কোনায় কোনায়। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে সেতু চলে আসতো মিজান সাহেবের বিছানার পাশে। সেতুর দাদা ডাকে দিনের প্রথম সাক্ষাত হতো তার সাথে। কখনও কখনও দাদার কোলে বসে আনন্দ বোধ করতো। চিবুক ধরে আদর দিতো।

ওদের যাবার দিনে গেটের পাশে একটা ট্যাক্সি এসে অপেক্ষা করছিলো তাদের বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। মিজান সাহেব গেটের পাশে দাঁড়িয়ে চাপা কান্নায় গাড়িটার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন তাদের বিদায়কালীন দৃশ্য। গাড়িটা না ছাড়া পর্যন্ত তিনি ঝাপসা চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন ওদের বিদায় দৃশ্যের সব কিছু। তখন তিনি ছেলের মানসিক কষ্টের অবস্থা স্পষ্ট লক্ষ্য করলেন। দেখলেন ছেলের দুচোখ দিয়ে অঝোরে ঝরছিল বেদনার অশ্রু। পিতাপুত্র কেউ অশ্রু চেপে রাখতে পারেনি। তখন কারো মুখে কোন কথা নেই। সকলেই চুপচাপ। অবচেতন মনে মিজান সাহেব তাঁর ক্লান্ত দেহটা নিয়ে দাঁড়ানো গাড়িটার কাছে এসে স্নেহের সেতুর দিকে তাকিয়ে কাঁপাকাঁপা কণ্ঠে বললেন, 'দাদা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ?'

www.pathagar.com

কথাটা শুনে সেতু মিজান সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে কোলে বসা বাবার গলাটা জড়িয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। সে নিজেও কাঁদলো এবং মিজান সাহেবকে কাঁদিয়ে বাবা মায়ের সাথে চলে গেল দূর দেশে। তখন স্নেহের সন্তান নীরবে অশ্রু প্লাবিত নয়নে তার পিতার কাছ থেকে বিদায় নিলে ওদের গাড়িটা আস্তে আস্তে সামনের দিকে আগাতে থাকে। তখন মিজান সাহেবের ভেতর থেকে বড় কষ্টে "বিদায় বিদায়" কথাটা উচ্চারিত হচ্ছিল। তিনি আর কিছুই বলতে পারেননি। অশ্রু সজল নয়নে যখন তাদের বিদায় দিলেন তখন মিজান সাহেবের মনের কষ্ট কেউ জানলো না।

ইকবাল তার আদরের কন্যা সেতুকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রু বিগলিত নয়নে ফুঁপাতে ফুঁপাতে মিজান সাহেবের দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। গাড়িটা ধীর গতিতে চোখের আড়াল হলে জল ছলছল চোখ দুটো গোপন করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধীর পায়ে তিনি বাড়ী এলেন। তখন মেঘমুক্ত বৈশাখের হালকা পরন্ত বিকেল। উজ্জ্বল দিবসের ছায়া, কিছুটা ঠান্ডা মলয় আন্দোলিত হচ্ছিল বৃক্ষের শাখায় শাখায়। আসন্ন সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ বাড়ীটাতে কেবল তারা স্বামী স্ত্রী দুজনে। তখন কারো মুখে কোন কথা ছিল না। তাদের মনের ভেতরে ছিল অনেক চাপা বেদনা।

নির্মল সন্ধ্যা। আকাশে শুক্ল পক্ষের চাঁদ উঠেছে। শশী তারকার কিরণশোভায় উজ্জ্বল করে রেখেছিল বাড়ীর আঙ্গিনাটা। ঘরে পেতে রাখা চেয়ারটাতে বসে মিজান সাহেব বিষণ্ন মনে ভাবতে থাকেন জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তখন মনে হচ্ছিল তার সবকিছু যেন সাগরের তলদেশে তলিয়ে যাচ্ছে।

তাঁর মনের ভেতর সাতপাঁচ অনেক অতীত ঘটনা তোলপাড় করতে থাকে। ছেলেমেয়েদের বাল্যজীবনের ঝাঁকঝাঁক স্মৃতিকথা তাঁর মনের গভীরে কিলবিল করতে থাকে।

আজ মিজান সাহেব তাদের ছেড়ে বড় একা। জীবনে একঘেয়েমির টানে বেঁচে আছেন। সেতু সেও মিজান সাহেবের মনটা ছিঁড়ে নিয়ে বাবামায়ের সাথে চলে গেল সাত সাগর পারে। তাই ঘরে তার উরুউরু মনটা টিকাতে পারছেন না। সেতুর কথা মনে হলে তাঁর ভেতরটা হুহু

www.pathagar.com

করে উঠে। আঁখি নিঃসৃত বেদনার অশ্রু দুচোখ বয়ে টপটপ করে ঝড়তে থাকে। তিনি কাউকে তা জানতে দেন না। তখন তাঁর উদাস মনটা খাখা করে ওঠে। মনের অনুতাপ মনেই চেপে রাখেন। এরপর থেকে মিজান সাহেব চুপচাপ থাকেন। কথাবার্তা কম বলেন। স্ত্রীকেও কিছু বলতে মন চায় না। দেখলে মনে হয় একরাশ চিন্তা তার মাথার মধ্যে ঘুর পাক খাচ্ছে। খাওয়া দাওয়া চলাফেরা সব কিছুতে একটা বিষাদ এবং বিমর্ষ ভাব।

তিনি কাঁদাকাঁদো হয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে আপন মনে বলতে থাকেন, হায় কপাল! "সবই আমার ব্যর্থতার প্রতিফল। জীবনে আর্থিক কষ্টের আঘাত এসেছে বারবার। সহ্য করেছি সংসার জীবনে, সহ্য করেছি সন্তান সন্ততি পালনের সকল ক্ষেত্রে। সংসারে আর্থিক সুখ ফিরিয়ে আনা অসাধ্য ছিল আমার মত একজন সামান্য বেতনভোগী কর্মকর্তার পক্ষে। সারাটা জীবন আর্থিক যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছি। আমার কাছে এ যন্ত্রণা দূরারোগ্য ব্যাধীর যন্ত্রণার চেয়ে আরও বেশী কষ্টের।"

চাকরি জীবনে অবৈধ লোভ মানুষকে টেনে নিয়ে যায় পাপের তলদেশে। তিনি পাঁপে ডোবেননি। আক্ষেপ করে বললেন, "আমার আর্থিক উন্নতির পথে ছিল অনেক সমস্যা। দিতে পেরেছি পিতা হিসেবে যৎসামান্য। ছেলেমেয়েদের যতটুকু দিয়েছি এবং যতখানি তাদের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছি অতোটাই ঋণী থেকে গেছি তাদের কাছে।"

মিজান সাহেব নির্বোধের মত মনে মনে চিন্তা করতে থাকেন তার অনেক ঋণ ছেলের কাছে জমা হয়ে গেছে। তিনি এ ঋণ আর শোধ করতে পারবেন না। হয় তো এ কারণে ছেলে তার জীবনের বাকীটুকু পাওয়ার আশায় স্নেহের কন্যা সেতু এবং সহধর্মিণী পারুকে সঙ্গে নিয়ে সুখ শান্তি লাভের আশায় দেশ ছাড়লো।

হঠাৎ তাঁর মনে হলো এশার নামাজটা বাকী আছে। চেয়ারটা দুহাত দিয়ে পেছনে টেলে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। আলগোছে ধীরে পায়ে বাথরুমে ঢুকে ওজু করে এলেন। এরপর আল্লাহর স্মরণে গভীর ধ্যানে নামাজ শেষে করুণাময় আল্লাহর কাছে তাদের সবার জন্যে দোওয়া সেরে ক্লান্ত দেহমনটা নিয়ে বিছানায় শয়নে যাচ্ছেন। এমন সময় স্ত্রী ঘরে ঢুকে

www.pathagar.com

বললো, "এসো, কিছু খেয়ে নাও।"নীচু স্বরে মিজান সাহেব স্ত্রীকে বললেন, না থাক, কিছু খাব না। মনটা ভাল লাগছে না। ভেতরটা বড় ক্লান্ত। মাথাটাও ঝিমঝিম করছে।

তা হোক। কিছু না খেয়ে ঘুমাতে যেও না। না খেয়ে রাত উপোস দিলে ওদের অমঙ্গল হবে, স্ত্রী বললো।

কথাটা শুনে মিজান সাহেবের ভেতরটা ধক্ করে কেঁপে ওঠে। মনে মনে নাউজোবিল্লাহ পড়ে বললেন- দোয়া করি ওরা ভালয় ভালয় পৌঁছে যাক। দাও, এক কাপ চা সাথে দুটো বিস্কুট, আর কিছু না।

কিছুক্ষণ পরে চা বিস্কুট সামনে এলো। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে স্ত্রী বলল, খেয়ে নাও।

তিনি সবটুকু খাওয়া শেষ করে ঘরের আলোটা নিভিয়ে মড়ার মতো বিছানায় শুয়ে পড়লেন। চোখে ঘুম নেই। হালকা হালকা ঘুম এলেও একটু পর পর ঘুম ভেঙ্গে যায়। প্রতিবারই জেগে উঠেন। শুয়ে শুয়ে তিনি কত কি ভাবতে থাকেন! ভাবতে থাকেন, "জীবনটা যখন জটিল ছিল তখন প্রয়োজনে করেছি কত কষ্ট। আজ এই বিরল শূন্য জীবনটা কী ভাবে কাটবে জানি না"। তিনি চিন্তা করতে থাকেন, "তবে কি সত্যিই জীবনটা ওলটপালট হয়ে গেল?"

সেতু ছিল মিজান সাহেবের বাঁচার প্রাণশক্তি। তাকে অবলম্বন করে পীড়িত মনটাকে আনন্দ মধুর রাখতেন। দুনিয়ায় মানুষ হারিয়ে কাঁদে, আবার কেউ পেয়ে হাসে। কেউ জ্বলেপুড়ে নিজেকে করে দগ্ধ। আজ তিনি ওদের সবাইকে ছেড়ে যেমন কাঁদছেন তেমনি ব্যাথার আগুনে নিজেকে করছেন দগ্ধ।

আশার স্বপ্ন নিয়ে মিজান সাহেব ভেবেছিলেন ছেলে বড় হলে বৃদ্ধ বাবা মায়ের ভবিষ্যৎ দুঃখকষ্ট কেটে যাবে। দুঃখকষ্ট সমস্যার পরিবর্তন আনবে। বাবা-মায়েকে শেষ বয়সে সুখের মুখ দেখাবে। তাদের বয়স যত বাড়ছে মিজান সাহেবের বয়সও ক্ষয় হতে হতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর একদিন তিনি ফুরিয়ে যাবেন।

www.pathagar.com

তিনি চাকরি জীবনে নিজেকে অভাবের উর্ধ্বে রেখে জীবনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন নির্মল চিত্তে। তিনি আপন সত্যকে সাথে নিয়ে আত্মবিশ্বাস তৈরী করে সংসার ধর্মের ভূমিকা পালন করে গেছেন। ভবিষ্যৎ স্বস্তির আশায়। তাঁর জীবনটা দুর্গতির বেড়াজালে জড়িয়ে থাকলেও তিনি ভেবেছিলেন একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন তিনি সুখের শিখরে উঠে শান্তির ছায়া পাবেন। এ বিশ্বাস আজও তাঁর হৃদয় থেকে নিঃশেষ হয়নি। এবং তিনি নিরাশও হননি। এটা তাঁর অন্তরে দীপশিখার মতো দীপ্তময় হয়ে রয়েছে।

ছেলেমেয়েদের জন্মের পর পিতামাতার বেঁচে থাকার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাদের সন্তানদের জন্যে। মিজান সাহেব এটা ভালোই বোঝেন। মেয়ে বড় হলে বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত, ছেলে বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পিতামাতার ত্যাগের ব্রত থেকে এতটুকু বিরাম থাকে না। এ কারণে পিতামাতা কাছে সন্তানের স্থান অতি উঁচুতে। এই একটা আদর্শেই ইকবাল তা বজায় রাখবে এ বিশ্বাসে তিনি অটল। এই মূল্যবোধে তিনি কোনদিন ছেলের কাঁধে দায়ভার চাপাতে রাজি নন। ছেলে তার পত্নীকন্যাদের নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাক এটাই মিজান সাহেবের বড় কামনা।

ইকবাল তার লৌহখুঁটিসম সরকারি চাকরি ত্যাগ করে সপরিবারে সুখ শান্তি লাভের আশায় ভাগ্যান্বেষী হয়ে চলে গেল সাগর পাড়ে। মিজান সাহেব তাঁর ভগ্নমন নিয়ে মনে মনে বলতে থাকেন, তারা যত দূরে থাকে সুখে থাক। তাঁর অন্তরের পবিত্র দোয়া তারা সব সময় পাবে যতকাল তিনি আল্লাহর ধরাধামে জীবিত আছেন। তাঁর বাকী জীবনটা অসহায় অবস্থায় কেটে গেলেও ভগ্ন মনোবলকে পুঁজি করে তাদের জন্য তিনি বেঁচে থাকতে চান আরও কিছুদিন।

বার্ধক্যের আক্রমণ মিজান সাহেবের জীবনে এনে দিয়েছে জরাক্রান্ত অবসাদ। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। শরীরে অসুখের আবির্ভাব ঘটছে। বিপদে আপদে তাদের দেখার আর কেউ থাকলো না। কষ্ট হলেও সংসারের সব কিছু মিজান সাহেবকেই বহন করতে হয়।

www.pathagar.com

॥ শেষ প্রশ্ন ॥

[ইকবাল সপরিবারে বিদেশ যাওয়ার অনেক আগের একটি অনবদ্য ঘটনা। প্রায় দশ পনের বছর আগের কথা। মিজান সাহেব ঠিক করলেন এই গল্পের ভগ্নাবশেষ থেকে বাকীটুকু আর এক ভাবে গল্পের মতো বলে বলে সমাপ্তি ঘটাবেন। তিনি মুখে মুখে গল্পটা বলতে শুরু করলেন। গল্পটা ছোট হলেও রসে শুকনো নয়। এটা কোন বানানো গল্প কথাও নয়। এটা সত্যের ছোঁয়ায় পরিপাটিতে পরিপূর্ণ। এতে আছে জীবনের কঠিন কথা। জীবন রক্ষার প্রতি সৃষ্টির নিষ্ঠুরতা।]

যেদিন তিনি সাভারে এসে নিজ কর্মস্থলে যোগ দিয়ে এক নতুন পরিবেশে জীবন শুরু করেন তখন তাদের ছেলেমেয়ে সকলেই ছিল স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী। মিজান সাহেব চাকরি করে আর্থিক কষ্টে সংসার চালাতেন। চাকরিতে যা বেতন পেতেন তা দিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খরচ, বাড়ীভাড়া এবং পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন ইত্যাদি বিলের টাকা মিটিয়ে বাকীটুকু দিয়ে কোন রকমে খাওয়া খরচটা চালিয়ে নিতেন। বাসা বাড়ীর কাজের জন্য একজন ঠিকা কাজের মেয়ে ছাড়া আর কোন ঝি চাকর ছিলনা। তাঁর দুর্নীতি মুক্ত সামান্য গুণতি অর্থ দিয়ে চাকর পোষার সামর্থ ছিল না।

আজকাল চাকরি জীবিদের বাড়ীতে একটা চাকরবাকর না থাকলে সমাজে মুখ দেখানো যায় না। সমাজে কে গরীব কে ধনী তার অন্যতম বিচার হয় কার বাড়ীতে কটা চাকর, কার বাড়ীর বউয়ের অঙ্গে সোনার গয়নার দোকান সাজিয়েছে। মধ্যবিত্তের নীচের ধাপে থাকলে একটা চাকরই যথেষ্ট। তিনি তাও পারেননি। উপরের ধাপে উঠলে চাকর চাকরানী বাবুর্চি সবই থাকে। চাকর রাখার সামর্থ ছিলনা বলে সংসারে হাটবাজারের কাজটা মিজান সাহেবকেই করতে হতো।

অনেক সময় মাসের শেষে বেতনের টাকায় দৈনন্দিন খরচের কাটছাঁট করেও কুলাতো না। যে কারণে মাসের শেষে হাতে কিছুই থাকতো না। সুতরাং ছেলেমেয়েদের সখ সাধের দিকে তিনি কোন নজর দিতে পারতেন না। কোন সময় ছেলেমেয়েদের সাধ আহ্লাদের ভারী

www.pathagar.com

বায়না এলে আর্থিক শোচনীয়তার কারণে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে তাদের সখের আবদার এড়িয়ে যেতেন। এতে তিনি মনে কষ্ট পেতেন। পিতা হিসেবে তার জীবনে এই ব্যর্থতা কতখানি কষ্টদায়ক তা মনে হলে আজও মিজান সাহেবের ভেতরটা ব্যথায় ভরে ওঠে। অনেক সময় দৈন্যতার কারণে সামাজিক রীতিনীতি ত্যাগ করতে হয়েছে আয় ব্যয় অঙ্কের হিসাব মিলাতে যেয়ে। তাঁকে সারাটা জীবন অর্থচিন্তার ভার বহন করেই বাঁচতে হয়েছে।

কথাটা দিবালোকের মত সত্যি। অভাব মানুষকে অনেক সময় নীচে নামিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য তবুও মন মানসের ভারসাম্য ধরে রাখতে পারলে, আর্থিক যোগবিয়োগের সমস্যা অতোটা পীড়া দেয় না। চাকরিতে বাড়তি উপার্জনের সুযোগ মিজান সাহেবকে প্রভাবিত করতে পারেনি বলেই তিনি পরিচ্ছন্ন জীবন গড়তে পেরেছেন।

তিনি গর্ব করে প্রায় বলতেন, "এজন্য আমি সৃষ্টি কর্তার কাছে কৃতজ্ঞ। কেন যেন মনে হয় আমার সততায় বিশ্বাস আনতে না পেরে মমতার ছেলেমেয়েরা তাদের অসহায় পিতাকে অযোগ্য বিবেচনা করেছিল কী জানি না। এ কারণে নিজেকে সবার কাছে আনওয়ানটেড মনে হয়েছে।"

লোভলালসার উর্ধ্বে থেকে মিজান সাহেব চাকরি এবং সংসার এ দুটোর মাঝে ছিলেন অনেক যত্নবান। ধর্ম এবং সংসার এ দুটোর ঘাত প্রতিঘাতে তিনি জীবনকে কোনদিন ক্ষুণ্ন হতে দেননি। তিনি সবটুকু মনোবল ধরে রেখে জীবন কাটিয়েছেন নিষ্ঠার সাথে।

একদিন মিজান সাহেব যৌবন বয়সে পছন্দ করে সাদামাটা আয়োজনে বিয়ে করলেন। পলাশন গ্রামের এক সুন্দরী মেয়েকে। আকত পড়াবার সময় তাঁর চারপাশ ঘিরে বসলেন গ্রামের কয়েক জন গণ্যমান্য লোক। বিয়েতে যত বাকবিতন্ডা হয়েছে তা কেবল মাত্র দেনাপাওনা এবং কাবিনের টাকা নিয়ে। সেকালের বিয়েতে যৌতুক গ্রহণ ছিল একেবারে পরিত্যাজ্য বিষয়। খান্দানি পরিবারে এটা ছিল একটা নিকৃষ্ট কার্যকলাপ।

শর্তমত কাবিনের টাকার ফয়সালাটা ঠিকমত বিবেচনা করা হলে নূরজাহান নামে এক ষোড়শী মেয়ের সাথে ইমাম সাহেব তাদের বিয়ে

www.pathagar.com

পড়িয়ে দিলেন। নূরজাহান আজ মিজান সাহেবের স্ত্রী। যেদিন তিনি নূরজাহানকে চিরকালের জন্য বরণ করে বিবি হিসেবে ঘরে আনলেন সেদিন তার শরীরের গড়ন ছিল কত সুন্দর। বাড়ীর উপযুক্ত বউ। ভদ্র ঘরের মেয়ে। এর চেয়ে তিনি আর কি আশা করেন? নূরজাহান তার বাপের বাড়ীর সকল আনন্দ উল্লাস, ছোট বেলার সাথীসঙ্গী, আদরের ভাইবোনদের স্নেহ ভালোবাসা এবং মায়ের স্নেহ মমতা ছিন্ন করে চলে আসতে হলো আর এক নতুন পরিবেশে ঘর সংসার পাততে।

গাঁয়ের মেয়ে লজ্জা আর কুণ্ঠা প্রথম প্রথম তাকে বেশ আড়ষ্ট করে রেখে ছিল। মাস না যেতে গিন্নিপনায় কাঁচা জ্ঞান নিয়ে নতুন বউকে বিয়ের শাড়ী ছেড়ে আটপৌরে শাড়ী পরে, কোমড় বেঁধে সংসারটা জাপটে ধরে সব দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হলো তাকে। প্রথমে অথৈ পানিতে হাবুডুবু খাওয়ার মত অবস্থা হলেও শাশুড়ীকে খুঁটি হিসেবে পেয়ে আস্তে আস্তে তার হাঁকপাকানী লাঘব হতে থাকে। ক্রমে হাত পাকতে পাকতে হয়ে পড়ে পাকা রাঁধুনি। শাশুড়ীর কাছে শিখে নিলো কিভাবে রসনা তৃপ্তি ভোগের পোলাও, বিরিয়ানী, কোরমা, কালিয়া, চাঁপ, কোপ্তা, টিকিয়া, শামিকাবাব, জালিকাবাব, পাকারুই ও বাগদাচিংড়ি মাছের কোরমা তৈরী করতে হয়। নাস্তা তৈরীর কাজেও হয়ে পরে অনেক পটু। কচুরি, পুরি, ফুলকোলুচি, মোঘলাই পরটা সাথে নানা প্রকার সুস্বাদু হালুয়া তৈরী করার নিপুন কায়দা কানুনও শিখে নিল একের পর এক।

মিজান সাহেবের স্ত্রী সংসারে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে স্বামী পুত্রকন্যাদের সেবা করে গেছে দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। তার জ্বর হয়েছে। অসুখ হয়েছে তবুও তাকে সংসারের ঘানি ঠিকই টানতে হয়েছে। জীবনে বিশ্রাম কী আজও সে জানে না। সব কিছু চলছে তো চলছেই। কিছুতে কিছু থেমে নেই। এভাবেই তার জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছে সংসার মাঝে। টানাটানির সংসার। খেটেখেটে তার শরীরে ভাঙ্গণ ধরেছে। তবুও সে দমেনি। মিজান সাহেবের স্ত্রীর জীবনে ছিল দুটো স্বপ্ন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়েথা দিয়ে এখন প্রয়োজন বাসের জন্য একটা বাসবাড়ী। দেশের মাটিতে খোদা তার দুটো ইচ্ছাই পূরণ করেছেন রাজ্য জয়ের মতো।

www.pathagar.com

বিয়ের পর সংসারের সকল দায় দায়িত্বের বোঝা মিজান সাহেবের স্ত্রীকে নিতে হয়েছে। তার দিনকাটে সারক্ষণ কাজ করে। সারাদিন হেসেলের সকল কাজকাম, থালাহাঁড়ি, বাসনকোশন ধোয়ামুছা, বাসা বাড়ীতে বাঁদির মতো কাপড় কাচা, ঘরদোর মুছে সাফসুতরা করা। সংসারের খুঁটিনাটি সবই দেখবালের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে দাসীপত্নী হয়ে। এতে সে কোনদিন তার স্বার্থ পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করেনি। তার এতটুকু খেদক্ষোভও ছিলো না।

নূরজাহান অকাতরে বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা করে গেছে দিনরাত। আপন মায়ের চেয়েও পরম ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে বৃদ্ধা শাশুড়ীর পরিচর্যায় বিন্দুমাত্র ঘাটতি ছিল না তার। কষ্টের প্রতিক্রিয়াও তার মনে কোন সময় জন্ম নেয়নি।

মিজান সাহেব তাঁর স্ত্রীর পরিশ্রমের কষ্ট অনুভব করে কিছু বললে, সে হাসি মুখে বলতো, "কিসের কষ্ট গো! নারী হয়ে জন্ম নিয়ে যে দিন সংসার ধর্মে প্রবেশ করলাম সেদিন থেকে আমার ওপর কর্তব্য পালনের সীমা চূড়ান্ত হয়ে গেছে।" তুমি শুধু আমাকে আশীর্বাদ করো, আর কিছু চাইনা।

শান্ত কণ্ঠে নূরজাহান আবারও বললো, দেখ, "দুঃখে লাভ নেই, কষ্টের সহনশীলতায় আছে মনের আনন্দ। সংসারের কষ্টকে জীবনের সাথে মিশিয়ে নিতে পারলে মনের বোঝা অনেক হাল্কা হয়ে যায়। গার্হস্থ্য ক্লেশকে ভুলে থাকতে পারলে মনে পাওয়া যায় শান্তি। মানুষের দানে যেমন আছে তেমনি সংসারে সেবা দানেও আছে অনেক আনন্দ। সংসারে দুঃখকষ্ট আছে থাকবে, তবুও সংসারটা আমার কাছে সুখের আলয়।" এসব কথা স্বাধ্বী পত্নীর মুখে শুনলে মিজান সাহেবের মনের গভীরে বেজে উঠে আনন্দের মূর্ছনা।

মিজান সাহেব স্ত্রীকে সখের জন্য কোনদিন দামী শাড়ী, অঙ্গ শোভার জন্যে সোনাদানার গয়নাগাটি দিতে পারেনি। বছরান্তে ঈদুল ফিতরের সময় দিনমজুরের বউয়েদের মত সাদামাটা শাড়ী এবং বড়জোড় বাটার একজোড়া চপ্পল। কাতান জামদানী শাড়ীর কথা সে কানে শুনেছে। চোখে দেখেনি কোনদিন। এতে সে কোনদিন স্বামীর কাছে দুঃখ আফসোস করেনি, অভিমানও ছিলনা তার।

www.pathagar.com

মিজান সাহেবের অভাব অনটন তাঁর স্ত্রীকে কোনদিন পীড়িত করেনি। একারণে তার উদার মনের কথা বিবেচনা করলে তিনি গর্ববোধ করেন। তাঁর সংসার জীবনে আর্থিক চিন্তার কদর্য স্ত্রীকে কোনদিন স্পর্শ করেনি। তিনি গর্বকরে বললেন, "সত্য বলতে কি বিয়ের পর থেকে আমি স্ত্রীর কাছে আন্তরিকতা এবং সহানুভূতি সময়ে অসময়ে যথেষ্ট পেয়েছি বলে কষ্টের সংসারটা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে"।

সংসার স্রোতের টানে স্বামীস্ত্রী দুজনেই ভাসতে ভাসতে আর এক পৃথিবীতে এসে বেঁচে আছে। দুঃখের কাঁমড়ের যন্ত্রণা সহ্য করে সংসার যাত্রাপথে দীর্ঘ পঞ্চাশটি বছর পার করে পরিণত বয়সে এসে একা হয়ে গেছেন।

আমাদের দেশে বাঙ্গালী সমাজে বৃদ্ধ বাবা মায়ের বেঁচে থাকার একটা সামাজিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে সন্তানের আয় রোগজারের উপর। মিজান সাহেবের কাছে এরূপ আশা ছেলেমানুষি মাত্র।

জগতে বুদ্ধিমানেরা চাকরি করে টাকা জমায়, সোনার দোকানে সোনার গয়না কেনে। স্ত্রী পুত্রকন্যাদের নিয়ে আনন্দে জীবন যাপন করে। তাদের চাকরি জীবনটা ফন্দি ফিকির করে কেটে যায়। তারা অন্য চিন্তা করে না। সবার চোখের সামনে সুখের সাগরে ভেসে বেড়ায়। তাদের ফুর্তির কমতি হয়না। সাজসজ্জারও অন্ত থাকে না।

ভেতরের চাপা ব্যথা নিয়ে তিনি চিন্তা করতে থাকেন সেই একই কথা যেদিন তাঁর স্নেহের সন্তান পিতামাতা এবং আত্মীয় পরিজনদের বন্ধন ছিন্ন করে দেশ ছাড়লো। ভাবতে থাকেন পাশ্চাত্য ভাবধারায় সেখানে তারা উজ্জীবিত হবে, জীবনকে একদিন কর্ম চাঞ্চল্যতায় উদ্ভাসিত করে তুলবে। কিন্তু যাতনা ভোগে পীড়িত জনক জননীকে ছেলের মাসহারায় বেঁচে থাকতে হবে। বাঁচার জন্যে ছেলে মাঝে মাঝে মাসহারা পাঠালে হাত পেতে তা গ্রহণ করতে হবে। না নিলে হয়তো ভুল হবে। এটাই বড় সান্ত্বনা।

অসহায় পিতামাতাদের প্রতি তাকিয়ে দেখার জন্যে একমাত্র প্রবাসী সন্তান ছাড়া আর কেউ থাকলো না। ছেলের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি কোনদিকে

www.pathagar.com

যাবে তিনি জানেন না। এ নিয়ে ভাবতে গেলে তিনি মনে কষ্ট পাবেন। মানসিক অশান্তিস্তে ভুগবেন। ভবিষ্যতের ফয়সালা ভবিষ্যৎই করে দেবে। সন্তান তার জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকুক মিজন সাহেব এটাই চান।

জলভরা চোখ দুটো মুছতে মুছতে তিনি আবারও ক্লান্ত মনে বলতে থাকেন, "এখন আমরা অক্ষম, নিরূপায় এবং দুঃখ পীড়িতে আক্রান্ত। এই নিদারুন অবস্থায় ছেলের মাসহারায় আমাদের বন্দি থাকতে হলো। আমাদের জীবনের ভার ছেলেকেই বহন করতে হলো। এখন থেকে প্রবাসী ছেলের দিকে অধির হয়ে তাকিয়ে থাকতে হবে মাসহারার উপর নির্ভরশীল হয়ে। বিধাতা হয়তো এটাই সাব্যস্ত করে দিলেন"।

মিজান সাহেব বিষণ্ন মনে নিজের ভাগ্যের কাছে প্রশ্ন রাখলেন, তবে এর শেষ কোথায়? এই শেষ কথাটা দিয়ে তিনি তাঁর গল্পের গল্পটা এখানেই শেষ করলেন। তখন তাঁর শরীর থেকে ঘাম এবং চোখ দিয়ে পানি ঝড়ছিলো।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

লেখক আবুল হোসেন পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলায় ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা হালিমা খাতুন ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মহিলা। পিতা আবদুস ছামাদ কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় শিক্ষকতা পেশায় ব্যয় করেন।

আবুল হোসেনের শিক্ষা জীবন শুরু হয় মাদ্‌রাসা শিক্ষা দিয়ে। তিনি জুনিয়ার মাদ্‌রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করে স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষা শেষে কলকাতার স্যার আশুতোষ কলেজ থেকে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন।

লেখকের কর্মজীবন শুরু হয় ব্যাংকের চাকরি দিয়ে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সর্বস্ব হারিয়ে তিনি নিশ্বঃ হয়ে পড়েন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বিটিএমসি এর অধীনে টেক্সটাইল মিলে চাকরি করে পরিবার পরিজনদের নিয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য জীবনপথে নতুন করে এগিয়ে চলেন। ২০০৩ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন। নিয়ম অভ্যাসের ধারাবাহিকতায় তিনি একজন পরিশ্রমী মানুষ। তিনি মনেপ্রাণে নিজের কাজে আনন্দ পান। কাজ তাঁর ভাল লাগে। ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত। চিন্তাশক্তির অনুভূতি নিয়ে চাকরি জীবনের পরবর্তী সময় থেকে তিনি লেখার দিকে মনোযোগী হয়ে লেখনী ধরেন। কিন্তু বাকী সময়টা তিনি লেখার ঝোঁকে কাটাতে চাইলেও বার্ধক্যের ভারে তাঁর অনেক কিছু দুর্বল হয়ে থেমে যায়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com